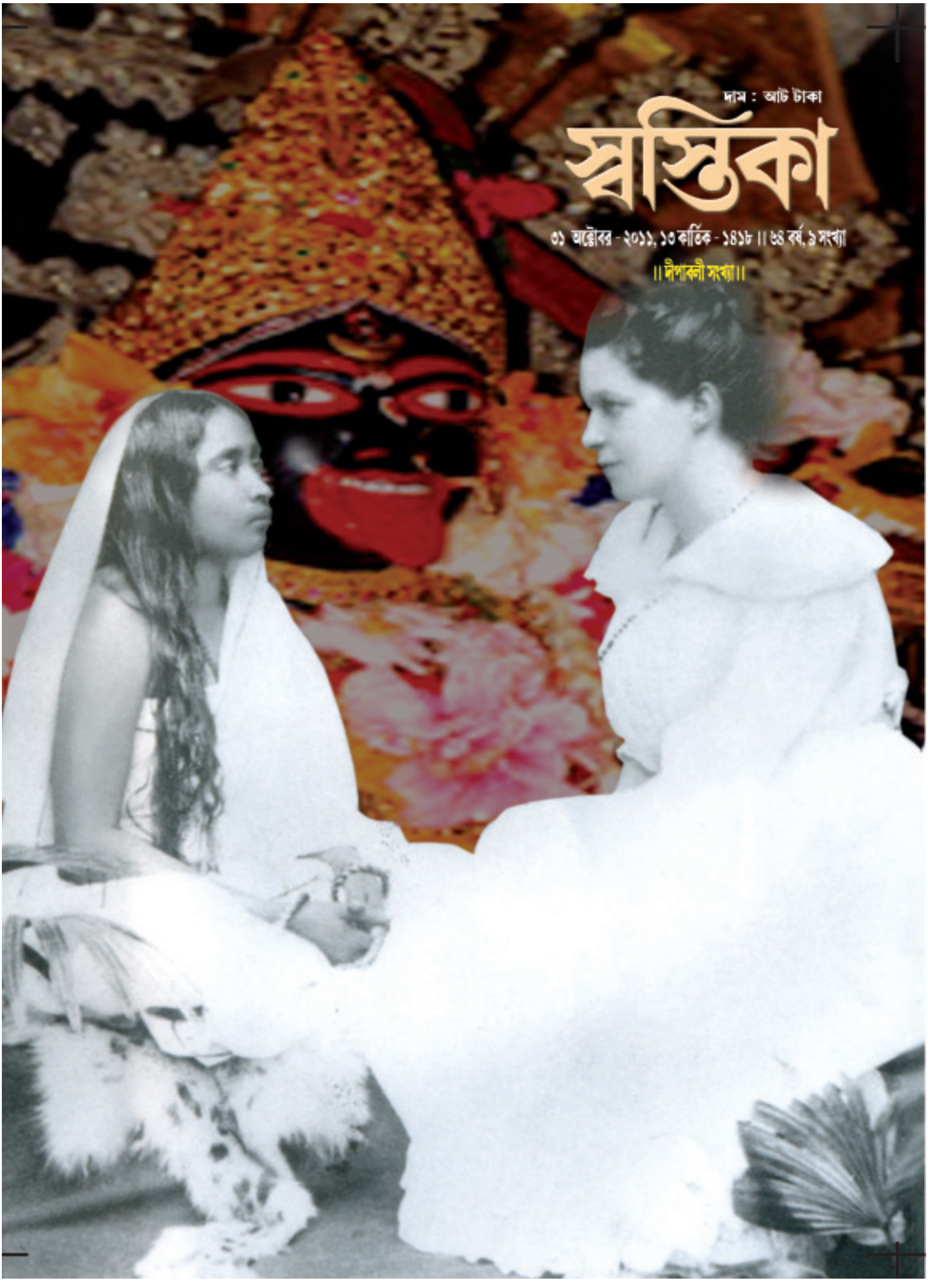

দাম : আট টাকা

স্বস্তিকা

৩১ অক্টোবর - ২০১১, ১৩ কার্তিক - ১৪১৮ ।। ৬৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা

।। দীপাবলী সংখ্যা ।।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৭

সর্বং কালীময়ং জগৎ ❑ স্বামী বেদানন্দ ❑ ৮

বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত ❑ মোহনরাও ভাগবত ❑ ১১

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আলোকে ভগিনী নিবেদিতা ❑
সত্যনারায়ণ মজুমদার ❑ ১৫

প্রেরণাময়ী নিবেদিতা ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑ ১৯

ভারতীয়ত্বে ভাস্বর ভগিনী নিবেদিতা ❑ ডঃ স্বরূপ ঘোষ ❑ ২৩

প্রয়াণের শতবর্ষে ভারতের নিবেদিতা ❑ আশিস গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ২৭

সুমহান সেবাব্রতী ভগিনী নিবেদিতা ❑ অর্ণব নাগ ❑ ৩১

কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত পরিবার ❑ ভগিনী নিবেদিতা ❑ ৩৫

নারী শিক্ষায় নিবেদিতার চিন্তা-চেতনা ❑ বন্দিতা ভট্টাচার্য ❑ ৩৭

মাতৃভাবের উচ্চতম আদর্শ নিবেদিতা ❑ ঋতা চক্রবর্তী ❑ ৩৯

ভারতভগিনী নিবেদিতা ❑ স্বামী বিমলাত্মানন্দ ❑ ৪৩

দার্জিলিংয়ে ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষ পালন ❑ ৪৫

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ১৩ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৩১ অক্টোবর - ২০১১ (দীপাবলী সংখ্যা)

দাম : ৮ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দীপাবলীর প্রার্থনা

অযোধ্যার রঘুপতি রাম রাক্ষসরাজ লঙ্কেশ্বর রাবণকে বধ করিয়া অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। জননী সীতাকে উদ্ধার করিয়া বিজয়ীর বেশে শ্রীরামচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করিলে বিজয়ের স্মারক হিসেবে অযোধ্যা নগরীকে দীপালোকে সজ্জিত করা হয়। সেই সময় হইতে আজ অবধি সারাদেশ দীপাবলী উৎসবে আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। দীপাবলী অন্ধকার হইতে আলোর দিকে যাত্রার উৎসব। আলোর উৎসব।

বর্তমান ভারতের পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়। দেশের বিভিন্ন দিকে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারী, আদর্শ আবাসন, কমনওয়েলথ গেমস, বিদেশী ব্যাঙ্ক গচ্ছিত কালো টাকা ইত্যাদি বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজের দায়ে অভিযুক্ত। এইসব অভিযোগের দায়ে কংগ্রেস ও সরকারের জোট শরিক ডি এম কে-র কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী, নেতা, আমলা ও কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর পদস্থ কর্তা এখন জেলে বন্দী। এইসব দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বাবা রামদেবের আন্দোলনকে রাতের অন্ধকারে যেভাবে নির্মমতার সহিত গুঁড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহা ১৯৭৫-এর জরুরী অবস্থার দিনগুলির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আন্না হাজার-এর আন্দোলন ও প্রস্তাবিত জনলোকপাল বিল লইয়া ইউ পি এ সরকার যে দ্বিধাচিত্ততার পরিচয় দিয়া চলিতেছে, তাহাতে সরকারের ভাবমূর্তি একেবারে তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। হরিয়ানা, অন্ধ্র, বিহার ও মহারাষ্ট্রের উপনির্বাচনের ফলাফলে তাহারই সংকেত মিলিয়াছে। বস্তুত স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এমন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আর হয় নাই।

সরকারের অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান নীতির ফলে কাশ্মীর সমস্যার কোনও সমাধান আজ পর্যন্ত করা যায় নাই। কাশ্মীর সমস্যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমস্যা নয়, দেশের উত্তরাংশের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সমস্যাটিকে বিচার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কাশ্মীরের সঙ্গে পাকিস্তান, চীন সহ কয়েকটি দেশের সীমান্ত যুক্ত রহিয়াছে। পাকিস্তান তো বটেই, এমনকী চীনও জম্মু-কাশ্মীরে অরাজকতা সৃষ্টি, উগ্রপন্থী এবং জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের মদত দিয়া চলিতেছে। সংবিধানের ৩৭০ ধারার মতো একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারাকে এখনও বাতিল করা হয় নাই। এমনকী ১৯৫৩ সালের পূর্বেকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করিবার বিষয়টিও কেন্দ্র সরকার নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীদের কথাবার্তায় লক্ষ্য করা যাইতেছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের মতো মাওবাদীদের কার্যকলাপও এক বড় বিপদ। দেশের প্রধানমন্ত্রী মাওবাদীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে দেশের প্রধান বিপদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের ৬০টি জেলায় মাওবাদীরা খুনের রাজনীতি আমদানি করিয়াছে। বহু নিরীহ নরনারী মাওবাদীদের হিংসার শিকার হইয়াছেন। মাওবাদীদের ঘোষিত নীতি— সশস্ত্র বিপ্লব অর্থাৎ বন্দুকের গুলি লইয়া তাহারাও নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চায়। অথচ সরকার— কেন্দ্র কিংবা রাজ্য এখনও পর্যন্ত কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্যান-ইসলামের বিস্তারবাদ— অনুপ্রবেশ, জন্মহারের বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্যের বিচ্যুতি এবং ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে জাতীয়তার পরিবর্তনও অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

সর্বোপরি রহিয়াছে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী চক্রান্ত, চীনের ভ্রূকুটি। ভারতবর্ষের ঘরে ও বাইরে সর্বনাশা যে কালো মেঘ দেখা যাইতেছে, যে অশনি সংকেত, তাহার মোকাবিলায় জাতীয় স্বাভিমানবোধ জাগরণের কাজ তাই সর্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দেশের মানুষের মধ্যে শক্তি, সাহস, মেধা, সমর্পণভাবনা সবই আছে। নেই কেবল স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে সদাজাগ্রত স্বাভিমান বোধ। এই বোধ সদা জাগ্রত রাখিতে হইবেই। দেশের একশো বিশ কোটি মানুষ তখনই মানবসম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। সুখের কথা, এই দেশে সেই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে নবীন প্রজন্মেরই সংখ্যাধিক্য। দেশ ও জাতির প্রতি নবীন প্রজন্মকে স্বাভিমান বোধে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিলে ভারতবর্ষ পুনরায় বর্তমান বিশ্বে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হইবে। দীপাবলীতে 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' প্রার্থনা তখনই সার্থক হইবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মাতৃভূমি ভারতবর্ষ বস্তুতঃ অখণ্ড। উত্তর ও দক্ষিণাংশ পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই রাজনীতি, জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে খণ্ডিত কোনও ভূভাগের ইতিহাস কখনও অখণ্ড ভারতের প্রকৃত ইতিহাস হইতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

আমি বিশ্বাস করি, বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।

আমি বিশ্বাস করি, ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জ্বলজ্বল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার নিকট আইস। আমাকে তোমার করিয়া লও।

—নিবেদিতা

সর্বং কালীময়ং জগৎ

স্বামী বেদানন্দ

আজকের যুগে মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে আমি প্রতি মাসেই প্রায় যাই। চিন্ময়ী মাকে মন্দিরে দেখে মনটা আনন্দে ও শক্তিতে ভরে যায়। মা ভবতারিণীর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। শুনেছি যে তাঁকে একবার দেখে এবং পূজা দেয় তার নাকি বারবার মাকে দেখতে ইচ্ছা করে। মা ভবতারিণী বেশ কোমল প্রকৃতির দক্ষিণা কালিকার মূর্তি। বাংলার সর্বত্র অন্যান্য যে দক্ষিণা কালিকার মূর্তি আছে ইনিও তাই। তবে এঁর বিশেষত্ব হলো যে, ইনি স্বপ্নযোগের মাধ্যমে সাধিকা রাসমণির কাছে এসেছিলেন। শোনা যায়, রানী এই স্বপ্নলাভের পূর্বে অনেক তপস্যা করেছিলেন। তখন রাসমণির স্বামী গত হয়েছেন। সংসারে স্বামীর মতো আপনজন মেয়েদের আর কেউ নেই। তাই রাসমণির মনে এল বৈরাগ্য। হলো তপস্যা করার বাসনা। এভাবেই জমিদার বাড়ির ভোগবিলাসী পত্নীর জীবনে পরিবর্তন ঘটে গেল। রানী হয়ে গেলেন ব্রহ্মচারিণী, যোগিনী, মনের কোণে একেবারে সন্ন্যাসিনী।

ধীরে ধীরে রানীর মনের ভেতরের মানুষটার বোধে এল— একটু কাশীতে গেলে হয়। বিশ্বনাথ বাবা ও অন্নপূর্ণা মাকে পূজা, প্রণাম, নৈবেদ্য নিবেদন করলে তো মন্দ হয় না। সঙ্গে কাশীর ব্রাহ্মণভোজন, দু'চারটে পুণ্য কর্ম করা সুযোগ পেলে। অবশেষে মনের চিন্তাভাবনাগুলি গুছিয়ে এনে রানী কাশী যাওয়ার মনস্থ করলেন। ১৮৪৭ সালের শীতকালের একটি নির্দিষ্ট দিনে। দেখতে দেখতে সেই সুনির্দিষ্ট দিনটা চলে এল। এদিকে ২৫টি নৌকা গঙ্গার ঘাটে প্রস্তুত। তাতে কী নেই? চাল-ডাল- গাভী-গাভীর খাদ্য-নাপিত-দারোয়ান-ডাক্তার-বৈদ্য-তেল-লবণ-বস্ত্র — পাকা ব্যবস্থা ছ'মাসের জন্য। তা দিনমানেই তরীতে চাপতে স্থির করলেন রানী। সেইমতো অপরাহ্নেই নৌকাবহর ছেড়ে দিল। রানীর ইচ্ছা আজকের রাতটা পানিহাটির প্রসিদ্ধ ঘাটে

কাটাবেন। কিন্তু বাধ সাধল আকাশটা। হঠাৎ চারিদিক দুর্যোগ গ্রাস করল। মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল গঙ্গার চারপাশটা। রানী এই দুর্যোগে আর নৌকা নিয়ে যাওয়া স্থির নয় ভেবে ওখানেই সব বাঁধতে বললেন। মাঝি-মাল্লারা দেখলেন গঙ্গাতীর বরাবর গভীর অরণ্য যেন আচ্ছাদিত। দূরের গ্রামের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তা রানীমার আদেশ মতো যাত্রা বন্ধ করে নোঙর করা হল। স্থানটি ছিল দক্ষিণেশ্বর গ্রাম।

রানীমা সুনির্দিষ্ট সময়ে আপন নৌকায় সাত্ত্বিক আহার শেষ করে দেবদেবীদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে শুয়ে পড়লেন। রানী কখন যে গভীর নিদ্রায় চলে গেছেন তা আর মনে নেই। হঠাৎ মাঝরাতে কালী দেবীর মুখ রানীর চিত্তদর্পণে সহাস্যে জেগে উঠল। রানী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। আর পরক্ষণেই সারা শরীরে অসম্ভব শিহরনে পুলকে জেগে উঠলেন। চারদিকটা তখনো নিঃস্তব্ধ। মিষ্টি গঙ্গার বাতাস। দূরের মায়াবী জ্যোৎস্নার চাঁদ। দু' একটি রাত জাগা পাখির কলতান। এসব নিশীথ প্রকৃতির মনোরমা শোভার মধ্যেই রানীর মনে কেবলই গুনগুনিয়ে ওঠে, ''তোর আর কাশী যাওয়ার দরকার নেই, গঙ্গার মনোরম তীরে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ওই মূর্তিটিতেই আবির্ভূতা হয়ে তোর নিত্যপূজা গ্রহণ করব।'' এত প্রাণময়, বাঙ্ময় যে স্বপ্ন হতে পারে তা দেবীপরায়ণা রানীর আগে বোধ ছিল না। কী মধুময় কণ্ঠ দেবীর— কী তার ভাববিহ্বলতাময় দৈবীবাণী— ''আমি এখানেই তোর নিত্য পূজা ও ভোগ গ্রহণ করব।'' এই দুটি শব্দেই ঝড় বহে গেল রানীমার মনে।

পরক্ষণেই রানী দৃঢ় সংকল্প করলেন— আর কাশী যাবেন না। গঙ্গার মনোরম তীরেই মাকে তাঁর অভিলাষমতো প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করবেন। আর তার যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ফিরে এল জানবাজারে। নৌকা ভর্তি জিনিসপত্র দরিদ্র মানুষজনদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হলো। রানীর আদেশে ভক্তিবান কর্মচারীরা জগন্মাতার মন্দির নির্মাণের জন্য জায়গা খোঁজার কাজে লেগে পড়ল।

অবশেষে জায়গাটা পাওয়া গেল। বর্তমানে যেখানটায় মন্দির হয়েছে সেই জায়গাটা। ১৮৪৭ সালেই নির্মাণ কাজ শুরু হলো এবং শেষ হতে লাগল মন্দির গড়ে উঠতে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রায় ৭ বছর। মন্দির শেষ হওয়ার বছর খানেক আগে থেকে রানীর বাড়িতে মায়ের মূর্তি তৈরি করার কাজ শুরু হয়ে গেল। তখনকার প্রখ্যাত মূর্তি প্রস্তুতকারক হাওড়া জেলার দাঁইহাট নিবাসী নবীন ভাস্কর এলেন রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে মূর্তি গড়তে। রাসমণি মায়ের মুখটা বুঝিয়ে দিলে সেইমতো সাড়ে তেত্রিশ ইঞ্চির কষ্টিপাথরের অপূর্ব দক্ষিণাকালিকা মূর্তি তৈরি হলো। মূর্তি যেমন যেমন তৈরি হতে থাকে রানীর তপশ্চর্যা ও সাধন-ভজনও বাড়তে লাগল। রানী এ-সময়ে ত্রি-সন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন,

মাটিতে শয়ন এবং যথাশক্তি জপ ও পূজাদি করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ভুবনমোহিনী ত্রিতাপ বিনাশিনী দক্ষিণাকালিকা মূর্তিটি রূপ পেল। কিন্তু এঁর তো একটা নাম রাখা প্রয়োজন? উদ্বেগে পূর্ণ রাসমণির চিত্ত— তাইতো মায়ের কী নাম রাখা যায়? আনন্দময়ী, সিদ্ধেশ্বরী, স্বপ্নদায়িনী মা— না, রানীর নিজের নাম একটাও নিজেরই পছন্দ হলো না। গুরুগতপ্রাণা রানী আপন গুরুদেব শক্তিমান সাধক রামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে একটা ব্যবস্থা করতে বললেন। গুরুদেব জানবাজারে এসে পুরোপুরি আপন আরাধ্যাময়ী মূর্তিটি দেখে চমকে উঠলেন। গুরুদেব রামসুন্দর নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সাধন-ভজন করতেন। আর কাছেই একটা দক্ষিণাকালিকা মন্দিরের জপ-ধ্যান ও প্রসাদ খেতেন। ওই দক্ষিণাকালিকা মায়ের নাম ছিল ভবতারিণী। এটির প্রতিষ্ঠা করেন নবদ্বীপের কালীভক্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্র। রানীর গুরুদেব এই মায়ের ভালোবাসায় পড়েছিলেন। রানীর গুরুকৃপা ও গুরুভক্তি এক্ষণে সকলের অজান্তেই জানবাজারে সদ্য দক্ষিণাকালিকা মূর্তিটির মধ্যে এসে মিশে গেল। রামসুন্দর জানবাজারে এসে আপন আরাধ্যাদেবীর ছাঁচ দেখে চমকে উঠে তাকে 'মা ভবতারিণী' বলেই ডেকে উঠলেন। তা শুনেই রানী চমকে ওঠেন এবং এই দক্ষিণাকালিকার নাম 'ভবতারিণী' রাখা হবে বলে স্থির হয়ে গেল। তা মা ভবতারিণী তৈরি হয়েই সুস্থ ও সাবলীল থাকার জন্য বাক্সবন্দি হয়ে রইলেন। কিন্তু জীবন্ত মা কি বাক্সে বেশি থাকতে পারেন আকাশ বায়ু ভক্ষণ করে? তাই গরমে ঘেমে নেয়ে একশেষ। আর সহ্য হলো না দেবীর। হঠাৎ স্বপ্ন দিয়ে রানীকে জানিয়ে দিলেন, ''ওরে, আমাকে আর কতদিন এভাবে আবদ্ধ করে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত শীঘ্রই পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।'' আবার মায়ের এরকম তীব্র স্বপ্নাদেশে রানী বিহ্বলা হয়ে উঠলেন এবং সামনের স্নানযাত্রার দিনেই মাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হলেন।

তখন ১৮৫৫ সাল। ১৫ জ্যৈষ্ঠ বা ৩১ মে। মন্দিরের মায়ের প্রতিষ্ঠা কাজের দিন ধার্য হয়েছে। এদিকে গদাধর তখন ১৯ বছরের যুবক। আর রাসমণির বয়স তখন ৬২ বছর। আর ক'মাসের মধ্যেই এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কালীভক্তের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটবে এবং বাংলা তথা পৃথিবীর বুকে যুগে যুগে মায়ের মহাপ্রকাশের লীলাকাহিনী প্রচারিত হতে থাকবে। পটভূমিকা প্রায় সব প্রস্তুত করেই মা অতি সন্তর্পণে তাঁর গূঢ় কর্ম করে যাচ্ছেন।

যাহোক, ১৮৫২ সালের এক শুভদিনে রামকুমার তাঁর ছোটভাই আপনভোলা গদাধরকে নিয়ে এসে উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুরের টোলে রাখলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মন্দির উদ্বোধনের ২/৩ বছর আগে থেকেই গদাধর কলকাতায় এসে পূজা করে এবং ভক্তিসঙ্গীত গেয়ে হাতটা এবং গলাটা কিছুটা পাকিয়ে নিয়েছেন। সামনে যে তার বিশাল দায়িত্ব। জগন্মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী হওয়া বলে কথা! তা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন এসেও ১৯ বছরের শিশু গদাই গোঁ ভরে কোনও জলস্পর্শ গ্রহণ করলেন না। বরং দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ উৎসব দেখে ফেরার পথে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে আপনমনে ঝামাপুকুরে চললেন। কিন্তু হুঁশিয়ারী গদাই লক্ষ্য করলেন দেহটা তার ঝামাপুকুরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মনটা তাঁর শতভাগই মায়ের রাঙা চরণে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঝামাপুকুরে ফিরে এসেও তাই গদাইয়ের মনে কোনও শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। কেবলই থেকে থেকে মায়ের সাজগোজ যা সে দেখে গিয়েছিল তাই চিত্তে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। কী দেখে গিয়েছিলেন সেদিন— তা গদাইয়ের ভক্ত মাস্টারমশাইয়ের কথাতেই লিখি— ''দক্ষিণের মন্দির সুন্দর পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। মায়ের ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর প্রস্তরাযুক্ত মন্দির তল ও সোপানযুক্ত উচ্চ বেদি। বেদির উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম। তাহার উপর শিব, দক্ষিণদিকে মস্তক— উত্তর দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী চেলি পরিহিত নানা ভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালী প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরি পঞ্চম, পাঁজেব; চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। ...মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে— বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে— তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণ নির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কানে কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। নাসিকায়— নথ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তে করে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণহস্তে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তর-পূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা—মা বিশ্রাম করেন।''

যাহোক, মায়ের ইচ্ছায় মন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠার ৩/৪ মাসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দ্রুত কতগুলি ঘটনা ঘটে গেল যাতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক মায়ের গদাইয়ের পূজারী হওয়ার সময় হয়ে গেছে। যেমন— (১) গদাধরের গঙ্গাতীরে সুন্দর শিবমূর্তি নির্মাণ এবং রানীর জামাই মথুরবাবুর চোখে পড়া। আর সেই মূর্তি নিয়ে রানী রাসমণিকে দেখানো। এতে ধাক্কা লাগল ভক্তিস্নাতা রানীর অন্তরে— কে এই মূর্তি নির্মাণকারী? (২) গদাধরের ভাগ্নে হৃদয়রামের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কর্মগ্রহণ করতে আসা, (৩) ১৮৫৬ সালে ৫২ বছর বয়সে হঠাৎ গদাধরের দাদা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু, (৪) দক্ষিণেশ্বর রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজারী ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে গোবিন্দজির মূর্তিটি পড়ে ভেঙে যাওয়া এবং গদাধরের অপূর্ব বিধানে রানীর তাক লেগে যাওয়া। ভক্তিমতী রানী শুনলেন, ছোট ভট্টাচার্য বিধান দিয়েছেন— ''রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে রানীমা আর একজনকে এনে তার জায়গায় বসাতো, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোত? এখানেও সেরকম করা হোক— মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনই পূজা করা হোক। ত্যাগ করা দরকার কিসের?'' কথাটি পৌঁছে গেল রানীমা'র কাছে। সম্মতি এল। আর গদাধর তারপর এমনভাবে ভাঙা মূর্তির পা'টা জুড়ে দিলেন যে দেখে বোঝাই যেত না। এইসব ঘটনার অন্তরালে দুটি হৃদয় একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কেবলই মিলেমিশে যাচ্ছিল।

কিন্তু দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পর দারুণ দুঃখে ১৯/২০ বছরের গদাইয়ের চিত্তে বহু মনোবেদনা এসে উপস্থিত হলো। সংসারের অনিত্যতা তাঁর চিত্তে মহাঝড় তুলল। অতি শৈশবে বাবাকে তিনি হারিয়েছেন। আর যৌবনের প্রারম্ভেই প্রিয় দাদাকে। তাই সত্য জীবন জিজ্ঞাসায় মেতে উঠল গদাধরের শুদ্ধ

মন। এই সংসারে সত্য কী? সৃষ্টিস্থিতি-সংহার কর্ত্রী মা কি সত্যিই আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? তিনি কি মনের দুঃখ লাঘব করে সন্তানকে তৃপ্তি ও শান্তি দেন? দিনে দিনে এই একই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় গদাধরের মন। মা তুই কি সত্যিই আছিস্? যদি থাকিস তাহলে দেখা দে এবার— মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, কমলাকন্তকে দেখা দিয়েছিস্— তবে আমাকে কেন দেখা দিবি না? দিন যায়, রাত আসে। কেবল এক বায়না গদাধরের। মাকে দেখা দিতে হবে। অন্তরের এই অবিরাম ব্যাকুলতা তাঁর সমস্ত চিত্তকে পাগল করে তুলল। গদাইয়ের কাতর প্রার্থনায় মা তাঁকে সূক্ষ্মরূপে দর্শন দিলেন। তা মায়ের সূক্ষ্ম রূপটা কী? মায়ের সূক্ষ্মরূপ হলো সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময়ী সত্তা। এখানে মা জ্যোতিঃস্বরূপা। যেমন দেবতাদের জ্যোতি থেকে তৈরি হয়েছিল দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। তেমনি রূপ। জ্যোতির্ময়ী। আর দুর্গারই বিবর্তিত রূপ হলো মা কালী। মায়ের সূক্ষ্মতম বা কারণরূপ হলো মহাশক্তি। যা দেখা যায় না, কেবল অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়। তা কেবল মহাসাধকের ধ্যানগম্য।

মা দেখালেন তাঁর অপার্থিব জ্যোতির্ময় রূপ প্রথমে। কেমন ছিল সেই দর্শন? মাতৃভক্ত গদাধরের কথাতেই লিখি, ''মন্দিরে মা'র দেখা পেলাম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, জলশূন্য করবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙরিয়ে থাকে, মনে হলো হৃদয়টাকে ধরে কেন যেন এমনটা করছে। মার দেখা বোধহয় কোনোকালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটপট করতে লাগলাম। অস্থির হয়ে একদিন ভাবলাম তবে আর এ জীবন রেখে লাভ নেই। মার ঘরে যে খড়্গ ছিল, দৃষ্টি সহসা তার দিকে পড়ল। পড়ামাত্রই এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করব ভেবে পাগলের মতো ছুটে ওটা ধরেছি এবং নিজেকে শেষ করে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় মার অদ্ভুত দর্শন পেলাম এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। সেই মুহূর্তে দেখলাম কি— ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল। কোথাও যেন আর কিছুই নেই। কেবল দেখছি এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি চারদিক থেকেই তা উজ্জ্বল সমুদ্র স্রোতের মতো তর্জন গর্জন করে গ্রাস করার জন্য মহাবেগে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেখতে দেখতে ওই জ্যোতিঃসমুদ্রের ঢেউগুলি আমার উপর এসে পড়ল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলিয়ে দিল। মুহূর্তে হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম।''

এরপর থেকে গদাধর আর একরকম হয়ে গেলেন। তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল মা আছেন, আছেনই। কিন্তু মনে বড় কষ্ট গদাইয়ের। জ্যোতির্ময়ী মূর্তি তো সে চায়নি। তাঁর প্রয়োজন মন্দিরে ভবতারিণী দেবীর বরাভয় মূর্তিটির জীবন্ত প্রকাশ। এতে মন ভরলেও প্রাণ ভরে না যে। তাই আবার কান্না শুরু হলো। সে কান্না যেন থামতেই চায় না গদাধরের। তার কান্নার বহরে চারপাশে লোক জমে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলের কোনও হুঁশ নেই তাতে। ছেলের কথায়— ''চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদেরকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির মতো অবাস্তব বলে মনে হোত এবং তার জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ হোত না। আর এরূপ অসহ্য যন্ত্রণাময় ব্যাকুলতার সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান থাকত না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখতাম— মার বরাভয়কারী চিন্ময়ী মূর্তি— দেখতাম ওই মূর্তি হাসছে, কথা কইছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিচ্ছে। ...শুধু তাই নয় মাকে হাত দিয়ে দেখেছি মা সত্য সত্যই নিঃশ্বাস ফেলছেন। তন্ন তন্ন করে দেখেও রাতে দীপালোকে মন্দিরের দেওয়ালে মার দিবাঙ্গের ছায়া কখনও পতিত হতে দেখিনি। আপন কক্ষে বসে শুনেছি, মা পাঁজর পরে বালিকার মতো আনন্দিতা হয়ে ঝমঝম শব্দ করতে করতে মন্দিরের উপরতলায় উঠে যাচ্ছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাইরে এসে দেখেছি— সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়িয়ে কখনও কলকাতা কখনও গঙ্গা দর্শন করছেন।'' এরপর গদাধর যখনই মন্দিরে মার কাছে আসতেন দেখতেন যে, পাষাণময়ী মূর্তি আর নেই— তার স্থলে এক জীবন্ত জাগ্রতা দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিতা হয়ে রয়েছেন। আর তখনই তাঁর অনুভবে ধরা পড়ত এই দেবী সামান্য নয়। এঁর চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন হয়ে রয়েছে। এ যেন— সর্বং কালীময়ং জগৎ, আর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যশক্তিই এক্ষণে পাষাণময়ীকে এক সাক্ষাৎ জীবন্ত চিন্ময়ী বরাভয়কর সুশোভিতা মঙ্গলময়ী রূপে পরিণতা করেছে। গদাধরকে আর পায় কে? মাকে এমনভাবে সাক্ষাৎ করা যায়? বিস্ময়ে তাঁর দেহ-মন আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল। তিনি আপনহারা, পাগলপারা হয়ে গেলেন। আর বিধি মেনে পূজা আরাধনা করতে পারলেন না। ফলে কখনও পূজায় দেবীর ফুল দেবীকে না দিয়ে নিজের মাথাতে দিতে লাগলেন, কখনও নিবেদিত অন্ন দেবীকে দেওয়ার পূর্বে নিজেই খেতে লাগলেন। কখনও-বা একান্তে মায়ের সঙ্গে আপনমনে নানা কথা কইতে লাগলেন, হাসিমস্করা করতে লাগলেন কিংবা মাকে গান শুনিয়ে নেচে নেচে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু মায়েপোয়ে এই ভালোবাসার সম্পর্ক যে কতটা গভীর তা বিষয়বাসনাপূর্ণ মন নিয়ে কালীবাড়ির লোকেরা বুঝতে পারবে কেন? তাই তাঁরা কেউ বুঝল না। খবর গেল জানবাজারে রানীমার কাছে যে ছোট ভট্টাচার্য পাগল হয়ে গেছেন। রানী সব শুনে জামাই মথুরকে একদিন চুপিচুপি গদাধরের পূজাকালীন সবকিছু দেখবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন দক্ষিণেশ্বরে। মথুর সকলের অগোচরে মন্দিরে এসে যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং ভাবলেন— এতদিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্য সত্যই এখানে আবির্ভূতা হয়েছেন। আর মায়ের পূজাও ঠিক ঠিক সম্পন্ন হচ্ছে। ভাবস্থ মথুর মন্দিরের কাউকে কিছু না বলে সোজা রানীমার কাছে উপস্থিত হয়ে সব কথা তাঁকে জানিয়ে বললেন, ''বহু ভাগ্যের গুণে এমন ভাবরাজ্যের মাতৃভক্ত পূজক পাওয়া গেছে। পাষাণ প্রতিমা যে জাগ্রত হয়েছেনই— এতে কোনও সন্দেহ নেই।' মথুরের কথাটা শেষ হতে না হতেই রানীর চিত্তটা সহসা টলে উঠল। তাঁর চারপাশটা কেমন স্তব্ধ ভাব ধারণ করল এবং ভেতর থেকে কে যেন বারবার তাঁর মনটাকে ধরে নাড়িয়ে বলতে লাগল, ''তোর আর কাশী যাওয়ার দরকার নেই, এই ভাগীরথীর তীরেই আমার মন্দির নির্মাণ করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর। আর সেই মূর্তিতে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ওই মূর্তিতেই আবির্ভূতা হয়ে তোর নিত্যপূজা গ্রহণ করব।''

বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত

মোহনরাও ভাগবত

৮৬ বছর আগে আজকের এই পবিত্র দিনেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ শুরু হয়েছিল। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার জন্মজাত দেশভক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য, সমাজজীবন সংস্কার ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যা কিছু সংঘর্ষ, আন্দোলন, অভিযান এবং জাগরণের কাজ চলছিল, সেই সব কাজে তিনি সক্রিয় এবং নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা ছিলেন। নিজ অভিজ্ঞতা এবং ওই সব কাজের নেতৃত্ব প্রদানকারীদের সঙ্গে ঐক্যমত্য ও আলোচনার নিষ্কর্ষ তিনি ঘোষণা করেছিলেন। দেশ ও দুনিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

বিগত বিজয়া দশমী থেকে এপর্যন্ত সময়ের গতিশীলতা যে পরিবর্তন সাধন করেছে তাতে আমাদের সবার চিন্তা বেড়েছে। এজন্য আমাদের সকলের এক সুনিশ্চিত লক্ষ্যে পুরুষার্থ-পরাক্রম প্রকাশের প্রয়োজন। দেশ ও দুনিয়ার যে বর্তমান চিত্র আমরা দেখছি তার ফলে মনে স্বভাবত উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক অবস্থা

পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ যাতে নিজ নিজ দেশের স্বার্থ পরিপুষ্ট করে এবং নেতৃত্ব বজায় রাখে এই দৃষ্টিতে সচেষ্ট। এরকমই একপ্রকার প্রতিযোগিতা চীন ও আমেরিকা নিজেদের মধ্যে করে চলেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকা তো আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়েছে।

শাসনকর্তাদের দুর্নীতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে একের পর এক গণ-অসন্তোষের জোয়ার দেখা গিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শাসকও বদল হয়েছে। এর পিছনে কোনও না কোনওভাবে আমেরিকার এবং ওইরকম অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এরকমই চর্চা, আলোচনা পৃথিবী জুড়ে চলছে। ভারতের উত্তর-দিকের দেশ চীনও এরকমই বিশ্বজুড়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বাড়িয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপনের খেলায় আমরা চাইলেও মূক দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাদের পরম্পরা অনুসারে সারা পৃথিবীকে স্বীয় আত্মীয় হিসেবেই মনে করি। তাদের উপর প্রভুত্ব নয় বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, মিত্রতার আকাঙ্ক্ষা রাখি। এই বাস্তব সত্যকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার থেকেই জানতে পারেন। আমাদেরকে তারা বিশ্বাস করেন, স্বাগত জানান। এই দৃষ্টিকোণ বজায় রেখে দেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে বিশ্বের অশান্ত পরিবেশকে বিশ্বাস ও সহযোগিতার পরিবেশে পরিবর্ধিত করার জন্য আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তো আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েইছে। যা ওই সব দেশে আজও আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। আর্থিক কল্যাণের দৃষ্টিতে তো আমরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সমনোভাবাপন্ন। ভারত এই সকল দেশের সুখ-দুঃখে সহভাগী ও নেতৃত্ব প্রদান করুক— এই মনোভাব ওইসকল দেশে রয়েছে। আমাদের দেশকেও ওই সকল দেশের সঙ্গে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে হবে। ভারতের সীমান্ত সংশ্লিষ্ট দেশ নেপালে সুস্থিতি এবং ভারতের অনুকূল পরিবেশ নির্মাণে আরও বেশি করে দৃষ্টি দিতে হবে। শ্রীলঙ্কার তামিলভাষীরা যাতে সেদেশে ভয়মুক্ত হয়ে ওখানকার নাগরিক জীবনে স্বাধিকারসম্পন্ন, নিরাপদ ও সকলের সঙ্গে সমরস হয়ে রাষ্ট্রজীবনে অন্যদের সমান অবদান রাখে— সেই অবস্থা নির্মাণে সচেষ্ট হওয়া দরকার। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত হোক, সীমান্ত নিশ্ছিদ্র, অনুপ্রবেশ এবং ওখান থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র, জাল-নোট অথবা নেশার উপকরণ ভারতে না আসে, ডাকাতি না হয়, ভারত থেকে গো-পাচার না হয়; সেজন্য দৃঢ়তার সঙ্গে অনুকূল পরিবেশ নির্মাণ করা প্রয়োজন। তিব্বত যদিও চীনের অধিকারে তবুও ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী তিব্বতীদের মনোভাবকে প্রকাশ করা, মানবাধিকার ও পরম্পরা সুরক্ষিত রাখা এবং তারা যাতে সসম্মানে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা দরকার।

চীনের চালাকি

চীন নিজেদের প্রয়োজনেই ভারতের সঙ্গে আর্থিক, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়াস করে, কখনও কখনও সক্রিয় দেখা যায়। তথাপি সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারত এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য তাদের চালাকি বিভিন্ন ঘটনায় ধরা পড়ে গেছে। ভারতের লেহ্-লাদাখ এলাকায় চীনা সৈন্যদের ঢুকে পড়া, ভারতের ভেতরের সেনা-বাঙ্কার ভেঙ্গে ফেলা, দক্ষিণ-চীন সমুদ্রে ভারতের জলজাহাজকে ভীতি প্রদর্শন করা; ভারতকে খনিজ তেল খোঁজায় বাধা দেওয়া— প্রভৃতি ঘটনা তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। এসবই টাটকা উদাহরণ। ভারত যদি ভিয়েতনামের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চায় তাতেও চীনের আপত্তি। উত্তর-পূর্ব ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে চীনের দারুণ খাতির— এখবর ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে আছে এবং সংবাদপত্রে ছেপে বের হয়েছে। আমরা শত্রুতা বা যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু ১৯৬২ সালে একবার আমরা দিবাস্বপ্নে বিভোর এবং সরল মনোভাবের জন্য ধূর্ত, কূটিল, রণনীতির শিকার হয়েছি। ভগবান বুদ্ধের সময় থেকেই চীনের সঙ্গে আমাদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের সামরিক শক্তি ও সতর্কতা, সীমান্তে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা প্রভৃতি পরিকাঠামো নির্মাণ করা দরকার। যে কোনও বিপদের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত পার্থিব প্রস্তুতি এবং বৈশ্বিক সমর্থন যোগাড় করার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কথাবার্তাকে আরও বেশি করে পরিপুষ্ট করা আবশ্যক।

কাশ্মীর পরিস্থিতি

দেশের পশ্চিম সীমান্তে আমাদের চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীন এখন উত্তর কাশ্মীরের গিলগিট ও বালটিস্থানে পৌঁছেছে।

ভারতের এই উত্তরাংশের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বকে (যেখানে ছয়টি দেশের সীমান্ত সম্মিলিত হয়) সঠিক উপলব্ধি না করে আমরা ওই এলাকাকে আক্রান্ত হতে দিয়েছি। পাকিস্তানের মদতে জম্মু-কাশ্মীরে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়, উগ্রপন্থীরা অনবরত অনুপ্রবেশ করতেই থাকে। অথচ বাস্তব হলো— পাকিস্তানের সংবিধান এবং নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারের কাশ্মীরের সর্বোচ্চ আদালত জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অঙ্গ বলে স্বীকার করে না। তারপরেও পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরে উপদ্রব অরাজকতা সৃষ্টিতে ব্যস্ত। তবুও বার বার কেন্দ্র সরকার এবং তাদের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীরা কাশ্মীরের সমস্যাকে কেবলমাত্র এক 'রাজনৈতিক সমস্যা' বলে দাবী কেন করছে? কাশ্মীরের সমস্যা কেবল এক রাজনৈতিক-সমস্যামাত্র নয়। সীমানার ওপার থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসবাদ ও কট্টরপন্থী মৌলবাদ কর্তৃক মদতপুষ্ট আক্রমণ এবং আমাদের অস্পষ্ট ও দোদুল্যমান নীতির ফলে উদ্ভূত সমস্যা। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক, শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট নীতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে আসীন শাসকদের গ্রহণ করা দরকার। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮-এ বাস্তুচ্যুত সকলকে নাগরিক অধিকার প্রদান করে ওখানে পুনর্বাসন দেওয়া, তথা ভারতভক্তিতে ওতোপ্রোত এবং হিন্দু হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদানে আশ্বস্ত করে বাস্তুচ্যুত কাশ্মীরী পণ্ডিতদের স্বীয় জন্মভূমিতে পুনর্বাসনের নীতিই আমাদের নীতি হওয়া দরকার। জম্মু ও লাদাখবাসী বিবিধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক (discrimination) নীতি সমাপ্তকারী শাসন-প্রশাসনই ওখানে থাকা চাই। ৩৭০ ধারার মতো দেশের একাত্মতাবিরোধী ধারাকে সমাপ্ত করার নীতি আবশ্যক। ১৯৫৩ সালের আগেকার পরিস্থিতির পুনঃপ্রবর্তনের চক্রান্তকে নির্মূল করা প্রয়োজন। কেন্দ্র নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারীরা তাদের মানসিকতা বদল করুন। কাশ্মীর সমস্যার বিষয়ে ১৯৯৪ সালে সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবই (পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত করতে হবে) মধ্যস্থতাকারীদের কথাবার্তার ভিত্তি হওয়া উচিৎ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে নিজেদের ওয়াকিবহাল হওয়া, অধ্যয়ন করা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ব্যথা-বেদনাকে বুঝে এগিয়ে চলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই অঞ্চলে নিজেদের গণভিত্তি পরিপূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়া সব উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে কেন্দ্র সরকারের শান্তিবার্তার মাধ্যমে নবজীবন প্রদান করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে মণিপুরে ৬০ দিন ব্যাপী অবরোধের পরেও শাসকদলের কানে কিছুই ঢোকেনি বলে দেখা যাচ্ছে। অবরোধ চললে ওখানে অনিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসবাদকে দমন করার জন্য শাসকদের কোনও তৎপরতাই চোখে পড়ছে না। সদিচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। রিয়াং জনজাতিরা মিজোরাম থেকে উৎখাত হয়ে ত্রিপুরার স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত। এটা যেন শাসকরা জানেনই না। অসমে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ থেকে উৎপন্ন পরিস্থিতি দেখেও সরকার স্থানীয় নাগরিকদের দুঃখ-দুর্দশা না জেনেই বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসে। ভারতের জমি বাংলাদেশকে দিতে তৎপর। সরেজমিন পরিস্থিতির অধ্যয়ন না করে অজ্ঞ থাকা, প্রদেশের জনগণের ব্যথা-বেদনার প্রতি উদাসীনতা, স্পষ্ট রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণের অভাব, এছাড়া সবকিছুর পিছনে রাজনৈতিক লাভালাভের মাপদণ্ডে দেখার দৃষ্টিকোণের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকেও কাশ্মীরের মতো সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিচিত্র কথাবার্তা বলেছেন। হয়তো দৃষ্টিকোণ, অজ্ঞতা এবং সংবেদনহীনতাই এর কারণ। উনি বলেছেন, দেশের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্যে মাওবাদ অথবা নকশালী সন্ত্রাস সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। তাহলে একথাই স্বীকার করে নিতে হবে যে, সন্ত্রাসবাদের কম-বেশি তারতম্য রয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে তথাকথিত 'অধিক ভয়াবহ' সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যে ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে— তাকেই সরকার দেশের যোজনা কমিশনে কী করে সদস্যপদ দিলেন? যে সন্ত্রাসবাদ দেশের একাত্মতা, অখণ্ডতা এবং ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তাকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা না করে নিজ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। উক্ত ব্যক্তি কথার বিভ্রান্তিজাল বুনে জনগণের চোখে পট্টী বাঁধা থেকে বিরত থাকুন। এসব কথাবার্তার কারণেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড মকুব করার দাবী রাজনৈতিক সমর্থন ও প্রশ্রয় পায়। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় সংসদে সন্ত্রাসী হামলায় দোষী আফজল গুরুর প্রাণদণ্ড রদ করার প্রস্তাব তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। অথচ অন্যদিকে ১৯৯৪-এ সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাবকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ ও প্রেরণা ব্যতিরেকেই চালানো চলছে।

অর্থনীতি

দেশের আর্থিক কাজকর্মে ওই একই নীতিহীনতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যে আর্থিক চিন্তাধারার ব্যর্থতা এবং অপূর্ণতা সারা পৃথিবীতেই সুস্পষ্ট দেখা গেছে। আমাদের নিজ জীবনমূল্যের ভিত্তিতে, জনগণের প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ, সমৃদ্ধির সঙ্গে সংস্কৃতির সামঞ্জস্য ও উন্নতি, উন্নতির সঙ্গে স্বকীয়তা সুদৃঢ় করার মতো উন্নয়নের নিজস্ব পদ্ধতির সন্ধান করতে হবে। এই নিয়ে টাল-মাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে বিগত ছয়টি দশক অতিক্রান্ত। কেবল পরানুকরণ করার ফলে সাধারণ জনগণকে তার দাম দিতে হয়েছে। একদিকে ভোগ্যপণ্যের দাম আকাশছোঁয়া অন্যদিকে সাংসদ ও বিধায়কদের বেতন বারবার বাড়ানো হয়ে চলেছে। গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে আর গরীবের পরিভাষা নিয়ে এখন বিতর্ক শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বর্ধমান জনসংখ্যার কথাও ভাবতে হবে। সেজন্য আবশ্যক কৃষি, গোচারণ ও বনভূমি সংরক্ষিত করার পরিবর্তে বিশেষ আর্থিক ক্ষেত্র (SEZ)-এর নামে কৃষিজমি জোরপূর্বক দখলের বিরোধী কৃষকদের উপর গুলি চালানো হচ্ছে। আমাদের এখানে প্রাপ্ত সৌরশক্তি, জৈবিক ও থোরিয়াম থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন না করে পশ্চিমের পরিত্যক্ত পারমাণবিক বিদ্যুতের ব্যবস্থাদি চড়া দাম ও শর্তসাপেক্ষে এদেশে আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সংগঠিত বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খুচরো ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিবর্তে খুচরো বাজারে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সীমিত আয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণকারী সাধারণ মানুষ ছেলেমেয়েদের বহুমূল্য শিক্ষার খরচ যোগাবে কীভাবে? এই দোটানায় সবাই ফেঁসে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ দেখছে জানছে— এদেশ থেকে চোরাপথে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করা হয়েছে। তা ফেরৎ আনার ব্যাপারে টালবাহানা। যারা ওই কালোটাকা জমা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবার বিষয়ে অহেতুক ঢিলেমি ও কালক্ষেপ করা হচ্ছে।

ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলন

চারদিক থেকে মার খেতে খেতে কোণঠাসা জনসাধারণের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অসন্তোষ দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার বিরোধী আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা ফেরৎ আনা, দুর্নীতি বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন এবং চাপ ব্যতিরেকে কঠোরভাবে তা প্রয়োগ, আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রীসহ সকল উচ্চপদস্থদের সামিল করার বিষয়ে জনমানসের প্রতিফলন এক বিশেষ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জনগণের চাপের কাছে শাসকদের মাথা নত করতে হলেও এখনও সাফল্য আসেনি। দুর্নীতির বিষয়ে কিছু ব্যক্তি বলির পাঁঠা হয়ে জেলে গেলেও বড় বড় রাঘব-বোয়ালরা

অধরা থেকে গেছে। তাদের কেউ হয়তো দুর্নীতির বিষয়ে প্রকাশ্য কেউ অপ্রকাশ্য। দুর্নীতি বিষয়ে যারা আন্দোলন করছেন তাদের ছোট-বড় সবাইকে একত্রিত হতে হবে দীর্ঘ আন্দোলন চালানোর উদ্দেশ্যে। ভ্রষ্টাচার কেবলমাত্র আর্থিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। তদন্তে জানা গেছে যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভ্রষ্টাচারীদের আর্থিক ব্যবস্থায় বিদেশী গুপ্তচর সংস্থা অথবা মাফিয়া গোষ্ঠী সংযুক্ত। এজন্য দেশের একাত্মতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে যাঁরা নিজেরা শুধুমাত্র কৃতিত্ব নিতে চান এরকম মনোভাবের গোষ্ঠীসমূহ থেকে দূরে থাকা উচিৎ। 'বন্দেমাতরম্', 'ভারতমাতা কী জয়' প্রভৃতি শব্দাবলীকে ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করে যারা সস্তা জনপ্রিয়তা পেতে চান তারা কোনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন না। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের সঙ্কীর্ণতা, কট্টরতা ও বিচ্ছিন্নতাকে খোসামোদ বা তোষণকারী মনোভাবের ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিশেষত যারা ধনাদি সাধন বিষয়ে বিশ্বাসী ও পারদর্শী প্রবৃত্তির— তাদেরকে সঙ্গে রাখতে হবে। তা না হলে আন্দোলনের বিরোধীরা এই দুর্বলতার ফাঁকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরিতে সচেষ্ট হতে পারে। তার ফলে যারা দেশের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করতে চায় তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যাবে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের কৃতিত্ব অথবা নাম-এর পরোয়া না করেই ভ্রষ্টাচার বিরোধী সকল আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু তাদেরকেও মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে ভ্রষ্টাচার-দুর্নীতি সমাপ্ত করা যায় না, ভ্রষ্টাচারকে উৎসাহ প্রদানকারী ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রশাসন পদ্ধতিকে আরও সক্ষম, দক্ষ এবং জনমুখী করতে হবে। সংস্কারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নির্বাচনের পদ্ধতিতে অপরাধীদের ও ধনবলের প্রভাব সমাপ্ত করার মতো সংস্কার করতে হবে। জনগণের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো সরল পদ্ধতির প্রচলন করতে হবে। কর-পরিকাঠামো আরও গ্রহণযোগ্য করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকীকরণ থেকে মুক্ত এবং সংস্কার প্রদানকারী করতে হবে। ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার ও পরিবর্তনের একটি সামগ্রিক চিত্র কল্পনা করে তা কার্যকর করতে চাপ দিতে হবে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো, সামাজিক দায়িত্ববোধ, বিশুদ্ধ চরিত্র, সেবা ও পরোপকার প্রভৃতি মূল্যবোধের সংস্কারের ব্যবস্থা করা। নিজের আচরণের মাধ্যমে উদাহরণ হিসাবে গ্রামে, শহরে, বস্তিতে- বস্তিতে, জনমানসে সংস্কারের পরিবেশ নির্মাণ ছাড়া সমাজ থেকে ভ্রষ্টাচার নির্মূল করা সম্ভব নয়। এই মৌলিক কাজের প্রতি সঙ্ঘের কাজ কেন্দ্রিভূত ও সক্রিয়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

কিন্তু আন্দোলন চলাকালীন যে সকল ঘটনা ঘটেছে এবং শাসনকার্যে উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিদের যে প্রবৃত্তি সামনে এসেছে তা চমকে দেওয়ার মতো এবং দুশ্চিন্তাজনক। যথার্থ দাবীর জন্য আন্দোলনকারী নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতি ছল-কপট, দমন-পীড়ন, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি বিদেশী শাসকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বাধীন দেশের নাগরিকরা নিজেদের সরকারের কাছ থেকে ওই ব্যবহার আশা করে না। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ এরকমই— যেখানে সরকারে টিকে থাকাটাই মুখ্য সেখানে দেশহিত, প্রজাদের কল্যাণ নিতান্তই গৌণ। এই ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য— সবাই তা বুঝতে পারছেন। এখানে একটা কথা উঠে আসে নতুন করে, এই রাজনীতিকদের হাতে দেশের ভবিষ্যৎ কতটা সুরক্ষিত! এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সাম্প্রদায়িক তথা টার্গেটেড হিংসা—প্রস্তাবিত আইন

রাষ্ট্রীয় একাত্মতা পরিষদের বৈঠকে এক নতুন প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অধিকাংশ ব্যক্তি ওই প্রস্তাবিত খসড়ার কড়া বিরোধিতা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী খসড়াটিকে সংশোধন করে পুনরায় পেশ করার কথা বলেছেন। কিন্তু খসড়াটি খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে— দেশ যাতে এক না থাকে, সামাজিক সৌহার্দ্য সমাপ্ত হয়, দেশের সংবিধানের মূল ভাবনার বিপরীত খসড়াটি বিকৃত বুদ্ধি থেকে উদ্ভুত। এই খসড়া প্রস্তুতকারক তথাকথিত রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ (National Advisory Council)-এর সাংবিধানিক মান্যতা ও অধিকার কি আছে তা কে জানে! এই পরিষদের প্রধান আবার ক্ষমতাসীন শাসক জোটের সভানেত্রী, তিনিই ইউপিএ মোর্চার প্রধান দলেরও অধ্যক্ষা। এখন প্রশ্ন— দেশকে চিরকালীন অশান্তি ও ঝগড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করার এই খসড়া তাঁর দেখাশোনায় কী করে তৈরি হলো? ওই উপদেষ্টা পরিষদে এমন সব তথাকথিত উপদেষ্টারা আছেন যাদের সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন? আমাদের দেশ পরিচালনা করেন দেশের মন্ত্রীবর্গ না তাদের আড়ালে দেশবিরোধী মনোভাবের ব্যক্তিরা? আমরা কি সত্যিসত্যিই স্বাধীন না লুক্কায়িত বিদেশী শক্তির কাছে পরাধীন? ওই খসড়াতে সংবিধানপ্রদত্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাজ্যের অধিকারকে অবহেলা ও অপমান করে রাজ্য সরকারকে মুখের কথায় অশান্তির আশঙ্কা আছে বলেই, তারই ভিত্তিতে বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে কাঠের পুতুল করে রাখা যাবে। এসবই গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তার বিপরীত। এটা কি দেশের জনগণের ঘুরপথে 'জরুরী অবস্থা' চাপিয়ে দেওয়ার সমান নয়? এই আইনে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেই তাঁর সংশ্লিষ্ট সংস্থা, দল, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রমুখকে দোষী ধরে নিয়ে সবরকম আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। এটা তো অন্ধকার নগরের শোভামাত্র যেখানে আইন, ন্যায়— কিছুই থাকবে না। খসড়াতে আবার 'মানসিক কষ্ট'-এর মতো কাল্পনিক অপরাধের বিচিত্র বর্ণনা আছে। ন্যায়-বিচার, গণতন্ত্র, সংবিধান প্রভৃতিকে ইচ্ছামতো অবহেলা করার বিকৃত মস্তিষ্কের অবদান এই খসড়া। এটা কি আলোচনা বা চর্চা করার যোগ্য? এই প্রস্তাবিত খসড়া দেশের একাত্ম ভাবনা-চিন্তার বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকদের পরস্পর ভেদাভেদ-এর প্রাচীর নির্মাণ করবে মাত্র। যা দেশ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের বিরোধী, ভারতের কল্যাণকে অবহেলা করার মতো বিনাশকারী বুদ্ধির পরিচায়ক।

সংবিধান, দেশহিত, সমাজের একতা ও সদ্ভাব-এর সংরক্ষণ করে সকলের প্রতি সমান আত্মীয়তার দৃষ্টি রেখে ন্যায়-এর সংবর্ধনকারী সক্ষম প্রশাসনই কাম্য। এজন্য নির্বাচিত সংসদ ও সরকারের উচিত শীঘ্রাতিশীঘ্র এই খসড়াকে আপাদমস্তক বিসর্জন করা, কোনওমতেই স্বীকার না করা। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, তাদের প্রতি ন্যায়বোধ সমাজে পরিব্যাপ্ত সদ্ভাবই প্রদান করে থাকে, শুধু আইনমাত্র নয়। এই সদ্ভাব-বিরোধী আইন কোনওভাবে আনার প্রয়াস হলে সমাজে ব্যাপক প্রতিরোধ ও অসন্তোষ-এর উদ্ভব হবে। এই চেষ্টার পিছনে দেশবিরোধী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী মানসিকতা প্রথম খসড়াতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। যদি সরকার এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে প্রচণ্ড অসন্তোষ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

সংগঠিত সজ্জন ও পুরুষার্থযুক্ত সমাজই একমাত্র পথ

সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও নির্ভয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণের অভাবেই নিরুৎসাহ, দোদুল্যমান নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, নিজের দায়িত্ব পালন না করার প্রবৃত্তি, নিহিত স্বার্থ প্রভৃতি দোষদুষ্ট রাজনীতি সমাজে কেবল অবিশ্বাসের আবহ নির্মাণ করছে। রাষ্ট্রজীবনের সকল ক্ষেত্রে বিদেশী প্রবৃত্তির জবরদস্ত অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সহমর্মিতাযুক্ত করে চ্যালেঞ্জ সমূহকে পর্যুদস্ত করে বৈভবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে। আসুরিক প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য দেবতাদের সমবেত তপস্যার ফলস্বরূপ সর্ববিজয়ী

কল্যাণকারী মহাশক্তিরূপিণী মা দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল। সৎশক্তি বিজয়ী হয়েছিল। এটাই প্রাচীন ইতিহাস। আজ আরও একবার পরিস্থিতি সজ্জনদের সম্মিলিত বিজিগীষু পুরুষার্থের আহ্বান জানাচ্ছে। এই দাবীকে এ মাটির পুত্ররূপ তথা ভাগ্যনিয়ন্তা হিন্দু সমাজকেই পরিপূর্ণ করতে হবে। সন্ত জ্ঞানেশ্বর মহারাজের জ্ঞানেশ্বরী'র (রচনা) শেষে প্রার্থনা করেছেন; দুষ্টদের অন্তরের কুটিলতা সমাপ্ত হয়ে সকলের সৎকর্মে প্রবৃত্তি হোক, পরস্পর সকলের মধ্যে বন্ধুত্ব হোক, সকল সঙ্কট দূর হয়ে সকলে ধর্মপথে পরিচালিত হোক। সকলের মনোকামনা পূর্ণ হোক— এরকমই প্রার্থনা করেছেন তিনি। এই প্রার্থনা পূরণের জন্য উনি বরও চেয়েছেন— সকলের মঙ্গলকামী, সদ্‌জন পরিপূর্ণ, সকলের প্রতি আপনত্বের ভাবযুক্ত, ঈশ্বরনিষ্ঠ সজ্জনসমূহ সদাসর্বদা সমাজে বিদ্যমান থাকুক। স্বাধীন, সমরসতাযুক্ত, শক্তিশালী, বিশ্বগুরু ভারতের কল্পনা বাস্তবায়িত হোক। এজন্য নিজজীবন উৎসর্গীকৃত দেশ-সেবারূপ যজ্ঞাগ্নি সদা প্রজ্জ্বলিত রাখা আধুনিক ভারতের সৃজনশিল্পী মহাপুরুষের বাণীর সারকথা। যাঁদের হৃদয়ে স্বার্থ ও বিভেদের লেশমাত্র নাই, দেশ ও সমাজের প্রতি অপার আত্মীয়তা ও সমবেদনা যাঁর মনে, আমাদের সনাতন ও পুরাতন রাষ্ট্রের পরিচয় বিষয়ে ওয়াকিবহাল, সকলকে যুক্ত করতে সমর্থ ভারতীয় সংস্কৃতি তথা আমাদের সবার পবিত্র অখণ্ডস্বরূপা চৈতন্যময়ী ভারতমাতার অব্যভিচারী ভক্তিপূর্ণ গৌরব যিনি নির্ভয়ে স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন, সেরকম সজ্জনদের সজীব মূর্তিমান উদাহরণ প্রত্যেক গ্রাম ও বসতিতে দাঁড় করাতে হবে। দেশব্যাপী সজ্জনশক্তির সামূহিক তপস্যা ও নিরন্তর নিঃস্বার্থ পুরুষার্থ দ্বারাই রাষ্ট্রজীবনের ভাগ্যসূর্য পূর্বগগনে উদিত হতে দেখা যাবে।

আহ্বান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ এই সর্বমান্য চিন্তাধারা ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য, হিন্দু সংগঠনের সংকল্প করে, আজ থেকে ৮৬ বছর আগে একটি প্রয়াস ছোট্ট আকারে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে তার এক বিরাট স্বরূপ নিয়ে অমোঘ সাধন হিসেবে আপনাদের সবার সামনে উপস্থিত। সকলে সহযোগী হোন। সমাজে সদ্ভাব, নির্ভয়তা ও জাতীয়তাবাদী পরিবেশ গড়ে তলুন। সকল স্বয়ংসেবক বন্ধুরা নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে একাজে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হোন।

সত্যের বিজয়— এই বিশ্বাস মনে রেখে আত্মবিশ্বাস যুক্ত হয়ে নির্ভয় চিত্তে নিরন্তর পুরুষার্থ ও কর্তব্যপথে সম্পূর্ণ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলুন। আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

রাষ্ট্রভক্তি লে হৃদয় মেঁ
হো খড়া যদি দেশ সারা।
সংকটোঁ পর মাৎ কর য়্যহ
রাষ্ট্র বিজয়ী হো হমারা।।

রাষ্ট্রসন্ত শ্রীতুকড়োজী মহারাজের কথায়—

"বনে হম হিন্দ কে যোগী হমারে জন্ম কা সার্থক
ধরেঙ্গে ধ্যানে ভারত কা হমারে মোক্ষ কা কারণ
উঠাকর ধর্মকা ঝাণ্ডা হমারে স্বর্গ কা সাধন
করেঁ উত্থান ভারত কা। য়্যহী উত্থান ভারত কা"।

।। ভারতমাতা কী জয়।।

(নাগপুরে সঙ্ঘের বিজয়া দশমী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণের বাসুদেব পাল কৃত বঙ্গানুবাদ)

হিন্দু জাতীয়তাবাদের আলোকে ভগিনী নিবেদিতা

সত্যনারায়ণ মজুমদার

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের এক গৌরবময় শুভক্ষণে এদেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দুরবর্তী ইউরোপ মহাদেশের আয়ার্ল্যান্ডে খৃস্ট ধর্মযাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর বিচার ও বুদ্ধিমত্তা পরিণতি লাভ করে তখন ফ্রয়বেলের ন্যায় শিক্ষাবিদদের শিক্ষাবিষয়ক অভিনব বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় মুগ্ধ হয়ে লন্ডনে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করে ইংরেজ জাতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। ১৮৯২ সালে লন্ডনের উইম্বলডনে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবাদে ও সুবক্তা হিসাবে সেখানকার বিদ্বজ্জনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বার্নার্ড শ, মার্জেশন ও লেডি মার্জেশন, হাক্সলি এবং তার সহযোগী কুকের সান্নিধ্যে এসে তিনি ভারতের দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, চিত্রকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। কেননা এ হেন সময়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, বেদ, গীতা বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন ইউলিয়াম জোন্স দ্বারা অনূদিত (ইংরেজীতে) কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্ ও হিতোপদেশের ন্যায় পুস্তকগুলি পাঠ করে। আংকেতিল দুপেরা উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন যা পাঠ করে শোপেনহাওয়ার বলেছেন—"The fruit of the highest human knowledge and wisdom". হ্যামবোল্ট গীতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার বলেছেন। হেনরী কোলব্রুক 'on the vedas' নামে প্রবন্ধ লেখেন। মনুর ধর্মশাস্ত্র অনুদিত হয়। যেগুলি পাঠ করে আগস্ট উইলহেমস্, ফাঁশ্লেগাল হামবোল্ট, ব্যালিক ইমারশন, ওখালট্ হুইটম্যান, টি. এস. ইলিয়ট ক্রিস্টোফার ঈশারউড প্রভৃতির ন্যায় বিদ্বজ্জন ভারতকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে ভারতের প্রশংসক হয়ে উঠেন। খৃস্টান মিশনারীগণ মনে করতেন নিজেদের প্রচারিত বাইবেলের তত্ত্ব অসার হয়ে পড়বে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার ঘটে, সেজন্য তাঁরা ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে আরও তীব্রভাবে। জ্ঞানপিপাসু ও ধর্মবোধে আগ্রহী নোবেলের সৃষ্টির অজ্ঞাত মূল কারণ— কে জানার যে তীব্র ইচ্ছা সৃষ্টি হয় তা হাক্সলী, টিন্ডল, স্পেনসারের ন্যায় দার্শনিকগণ পূরণ করতে সক্ষম হননি। এহেন দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে জানার জন্য মার্গারেট বুদ্ধের জীবনীও পাঠ করেন। এরকম মানসিক অস্থিরতা যখন তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল তখনই ঠিক তাঁর জীবনলক্ষ্য স্থির করার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে তিনি এসে যান লন্ডনে লেডি মার্জেশনের বাড়ীতে।

ভারতের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ ধর্মসংস্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব এবং হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারত স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এহেন গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পিত করে মার্গারেট হলেন নিবেদিতা। সুতরাং ভারতের পুনর্জাগরণের মূলমন্ত্র যে হিন্দুত্ব তাকেই যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৮৯৮ সালে ২৮ জানুয়ারী তিনি ভারতে এসে স্বামীজীর ইচ্ছাতে ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে যে বক্তৃতা দান করেন সেখানেই তিনি হিন্দু যে একটি জাতি তা স্বীকার করে নেন এবং ভারতের অর্থাৎ হিন্দুত্বের আধ্যাত্মিকতা যে একটি সম্পদ (Treasure) তাও নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেন— "আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র জগতের জন্য শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।"

ভারতকে সেবা করার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে স্বামীজীকে তিনি পত্র দিলে তিনি বহু চিন্তা করে ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদানের

জন্য তাকে ভারতে আসার আহ্বান জানান। সেই চিঠিতে এক নির্মম কঠিন সত্য তার কাছে প্রকাশ করে বলেন,— ''এদেশে যে কি দুঃখ, কি কুসংস্কার, কি দাসত্ব— সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না— এদেশে এলে দেখবে চারিদিকে অর্ধনগ্ন অগণিত নরনারী— জাতি ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে তাদের উদ্ভট ধারণা— শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভয় ও ঘৃণায়... এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর— তোমাকে জানাই স্বাগত— শতবার স্বাগত—''

মার্গারেটকে প্রকৃত হিন্দু হওয়ার জন্য কঠোর ত্যাগ ও কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছে, কারণ ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষালাভের পরও তার ইংরেজ জাতির প্রতি অনুরাগ হ্রাস পায়নি, কারণ দীক্ষা লাভের পরদিন স্বামীজী নোবেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি এখন নিজেকে কোন জাতির অন্তর্গত বলে চিন্তা করেন। তার উত্তরে স্বামীজী বুঝেছিলেন যে বৃটিশ জাতীয় পতাকার প্রতি মার্গারেটের তখনও গভীর শ্রদ্ধা যা ছিল স্বামীজীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। স্বামীজীর দীর্ঘকালীন শিক্ষা, কখনও বা তার প্রতি উপেক্ষা, কখনও বা গভীর স্নেহ তার আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করে এবং পরবর্তীতে তিনি হয়ে উঠেন মার্গারেট নোবেল থেকে হিন্দু নিবেদিতা। তারপর ভারতের জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দীর্ঘ দশ বছর ধরে ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি যা কাজ করেছেন তা আজও প্রেরণাদায়ী।

নারী শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ভারতে এসে তিনি প্রথমেই যে কথা বলেছিলেন তাতেই হিন্দুজীবন সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা প্রকাশ পায়— ''হিন্দুরমণীগণের পক্ষে শিক্ষার প্রধান উপকরণ তাহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রভাব। কোনও জাতির শিক্ষার প্রণালী নির্দেশ করতে গেলে শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহার অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ জীবনের পর্যালোচনা আবশ্যক— আমি যে কেবল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠভাবগুলির প্রতি অনুরক্ত তাহা নহি— আমি তাহার ভাল মন্দ সকল অংশের প্রতিই সহানুভূতি সম্পন্ন— সমুদয় লইয়া হিন্দু সর্বোচ্চ সভ্যজাতি এবং জগতের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজই সুন্দর শিক্ষায় সর্বাপেক্ষা উপযোগী অবস্থা বর্তমান। পৃথিবীতে হিন্দুগার্হস্থ্য জীবনের ন্যায় সুন্দর বস্তু বোধ হয় আর কিছুই নাই— ভারতীয় রমণীর আদর্শ প্রেম নহে— ত্যাগ। এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমি হিন্দু নারীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।''

শিক্ষা বিষয়ে তিনি চেয়েছিলেন সর্বজনীন নৈতিক ও অধ্যাত্মিক শিক্ষা যা আমাদের গুরুকুল শিক্ষার মাধ্যমে মুনি ঋষিগণ প্রবর্তন করেন এবং সেইজন্যই বলেছিলেন— ''ভারতীয় সমস্যার যথার্থ সমাধান হইতে পারে যদি এই কথা সানন্দে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।''

মূর্তিপূজা বিষয়ে খৃস্টান ধর্মযাজক ও ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি তাদের অসারতা প্রমাণ করেন— ''হিন্দুগণ বস্তুত মূর্তিকে পূজা করেন না। কোনও প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় করিবার ইহা একটি উপায় মাত্র। প্রকৃত পূজা প্রতিমার সম্মুখে অবস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের উপর অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই কুম্ভকেই অনন্ত শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়।'' তাঁর এই যুক্তি পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও স্বীকার করে নেন এবং ভারতের জাতীয়তা যে হিন্দুত্ব সে কথা স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচার করেন।

নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যে বিজেতা জাতি ইংরেজদের প্রভুসুলভ মনোভাবের কারণেই যে ভারত সম্পর্কে হীন অপপ্রচার হয়েছে তার ফলে অন্যান্য দেশ ভারত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আসছে। সুতরাং পরাধীনতাই হলো ভারতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়। জাতীয় ভাবনার দ্বারা তৎকালীন রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্য তিনি সেই কারণে তৎপর হন। রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের অর্থনীতি ও তৎকালীন রাজনীতি বিষয়ে অবহিত হন। গভীর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক শান্তিপ্রিয়তার সমন্বয় ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু তার মধ্যে থাকা দরকার তেজ ও শক্তি একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন— ''আজ আমাদের মাতৃভূমি জাতীয়তার জন্য আত্মোৎসর্গের কামনায় বিদীর্ণকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন— আজ তিনি শক্তিধর পুরুষের জনয়িত্রী ও পালয়িত্রীরূপে চাইছেন আমরা যেন তাঁকে মধুরতা ও মৃদুতার পরিবর্তে পুরুষোচিত তেজ ও দুর্ভেদ্য শক্তি প্রদর্শন করি। আজ তিনি চান আমরা খড়্গ নিয়ে তার সামনে খেলা করি যাতে তিনি বীরজাতির জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন— আমাদের চতুর্দিকে অতীতের কণ্ঠস্বর— জাগো— জাগো— জনগণই হবে শাসক তারাই থাকবে বিদ্যমান— জাতীয়তা তারই আহ্বান এনেছে।

বিপিনচন্দ্র পাল নিবেদিতার আন্তঃশক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই স্বীকার করেন— ''এই বৃটিশ নারী ভারতের জন্য যে প্রকার সর্বগ্রাসী ভালবাসায় উদ্দীপ্ত ছিলেন তার তুল্য ভালবাসা খুব কম ভারতবাসীর মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে দেখা যায়। নিবেদিতা যে ভাবে আমাদের কাছে এসেছিলেন সেই ভাবে আর কোনও ইউরোপীয় আসেননি... এই ভারতবর্ষ ও তার মৃত্তিকার যে রূপচ্ছবি তাঁর গুরু তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন তারই সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সতী হৃদয়ের ভালবাসায় তিনি পূর্ণ ছিলেন। আমাদের মধ্যে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিবেদন করেছিলেন... হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সত্তা ও সংস্কৃতির যথার্থ দ্রষ্টা।''

শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ ঘটেছিল রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিন্দুত্বকেই তিনি রাজনীতির চালিকাশক্তিরূপে দেখেছিলেন যা নিবেদিতারও কাম্য ছিল। হিন্দুনেতা হিসাবে অরবিন্দ তাঁর কাছে বিবেচিত হওয়াতে ইংরেজ শাসক যাতে তাঁর কোনও ক্ষতি সাধন করতে না পারে সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন। আলিপুর বোমা মামলা থেকে শ্রী অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেয়ে যখন পুনরায় কর্মযোগিন্ পত্রিকা প্রকাশে তৎপর হয়েছেন তখন শাসক-পক্ষ তাঁকে পুনরায় মামলাতে জড়ানোর চেষ্টা করছে জানতে পেরেই নিবেদিতা তাঁকে কলকাতা ত্যাগ করে চন্দননগরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও শ্রী অরবিন্দ এহেন আত্মগোপন পছন্দ করতেন না কিন্তু নিবেদিতার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকার জন্যই নিবেদিতার ব্যবস্থাতেই চন্দননগর চলে যান।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতার ভূমিকা ছিল অসামান্য। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ্ প্রভাবিত হয়েছিলেন নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ও আত্মশক্তির দ্বারা। তাঁর নির্দেশেই বহু লেখা তিনি পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। র‍্যাটক্লিফ্‌কে তিনি বলেছিলেন— ''আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব যদি ভারতবর্ষ আমাকে যেভাবে অনুভব করেছে তোমাকেও সেইভাবে অনুভব করতে পারে।'' নিবেদিতার প্রেরণাতেই র‍্যাটক্লিফ্ স্টেট্‌সম্যান পত্রিকাকে ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন করে তোলেন যা বৃটিশ শাসনের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠে। এর ফলে র‍্যাটক্লিফ্‌কে স্টেটস্‌ম্যান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয় এবং নিবেদিতার অনুরোধে ও সচেষ্টতায় গোখলে তাঁর একটি চাকরীর ব্যবস্থা করেন। যদিও তিনি

তা গ্রহণ করেননি।

বঙ্গ বিভাজন রোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও বয়কট (বিদেশী বস্তু) আন্দোলনকে জাতীয়তার পুনর্জাগরণ রূপে তিনি দেখেছিলেন এবং আন্দোলনের সমর্থনে তিনি বলেন— ''স্বদেশী ও বয়কট একই জিনিসের দুইটি প্রয়োজনীয় দিক। একটির সাহায্য ব্যতীত অপরটি বাঁচিতে বা বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যখনই কোনও স্বাধীন জাতি তাহার স্বদেশীয় শিল্পের অর্থাৎ স্বদেশীর উদ্ভব ও বিকাশের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে তখন সেই কাজে সে বিদেশী দ্রব্য বয়কট ভিন্ন সফল হইতে পারে নাই।

স্বদেশী ও বয়কট পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে যেমন আমেরিকা, ইতালি ও জার্মানীর জাতীয়তা সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, তেমনি ভারতের জাতীয়তার পুনর্জাগরণে তা যে সহায়ক হবে সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না। সেই কারণে তাঁর আহ্বান ছিল—''Let the Prayer go out of the heart of every patriotic Indian that success be to the cause of Swadeshi in India that the motherland again rise in prosperity and win the esteem and respect of other nations by the skill of her manufacturing sons and daughters. May Swadeshi and Boycott take such a firm root in the land of the holy rishis and sages, whose production both material and spiritual will excite the admiration of all peoples of the world, that nothing may be able to uproot them."

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উৎপাদন যে বিশ্ববাসীর প্রশংসা লাভে সক্ষম হবে তার প্রেরণা বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে এই দেশের প্রাচীন ঋষি, মুনিদের উল্লেখ করেছেন। এই ঋষি মুনিদের ত্যাগ ও তপঃশক্তির দ্বারাই হিন্দু জাতীয়তা সৃষ্টি ভারতে হয়েছে। তিনি সেই জাতীয়তার পুনর্জাগরণের জন্য সততই প্রয়াস চালিয়েছেন। হিন্দুত্বের মধ্যে রয়েছে সব মতবাদকে সহজ করার ও সত্যরূপে গ্রহণ করার ভাবনা যার ফলস্বরূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হিন্দুদের জীবনাদর্শ।

> **হিন্দুজাতির সংস্কৃতির মূল ইতিহাস, পৃথিবী আলোড়নকারী মনু প্রভৃতির নীতিশাস্ত্র, চানক্যের অর্থশাস্ত্র এবং গীতার অমরবাণী সারা বিশ্বকে ক্লেদমুক্ত করে নবজীবনদানে সক্ষম। এহেন কাজ যে হিন্দুদেরকেই করতে হবে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সজাগ ও সচেতন।**

সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ এসেছে গোঁড়ামি থেকে যার পোষক ও ধারক হচ্ছে খৃস্টান ও মুসলমান। এ বিষয়ে নিবেদিতার বক্তব্য হলো— ''খৃস্টধর্ম ও ইসলাম যা পৃথিবীকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী' —এই দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকে— তারাই পৃথিবীতে এনেছে সামরিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ। উদার মানবিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না বলে রোমানরা সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী না হয়ে পারিনি।

গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা যে জাতির মধ্যে থাকে তারাই একই প্রবাহে বিকাশমুখী নব পন্থার উন্মোচন করার প্রেরণা লাভ করে থাকে। এহেন জিজ্ঞাসা কেবলমাত্র হিন্দুত্বের মধ্যেই রয়েছে, তাই নতুন নতুন সত্যের সন্ধান হিন্দুরা লাভ করেছে। এর জন্যই পৃথিবীতে যদি শান্তি স্থাপন করার সামর্থ্য কারও থাকে তবে তা হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু জাতির মধ্যেই রয়েছে। নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গী হলো--- ''সাম্রাজ্য সত্যই অধোগতিকর। এইসব নিষ্ঠুর শিকার ও অপরের মুখের আহার্য গ্রাস করা কেন? না তার মধ্যেই কিছু লোক মোটর চড়তে পারবে— সকাল হতে না হতেই কারুকার্যখচিত পোষাক চড়িয়ে, গায়ে হীরা জহরত ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো বজায় রাখতে পারবে। নির্বোধ ধনীরা নিরানন্দ অপব্যয়ী নিরর্থক জীবনের গভীরে ডুববে— ডুববে— এর থেকে আমি দরিদ্রতম হিন্দু হব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে ধুলিতলে পদদলিত করে তার পরপারে প্রসারিত হবে দৃষ্টি।"

ভারতের হিন্দুজাতি বহু কুসংস্কারে জর্জরিত একথা সত্য, কিন্তু তবুও জীবনকে বুঝতে পেরেছে অতি সরল সহজ অনুভূতির মাধ্যমে--- উদারতা যেন হিন্দুদের জন্মগত প্রাপ্তি। ফলে হিন্দু সমাজ সারা বিশ্বকে আপন করে নিতে পেরেছে। বিদেশীকেও ভাই, বোন বলে আলিঙ্গন করে নিতে সক্ষম হয়েছে। নিবেদিতা তাই বলেছেন পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই বোধ হয় একমাত্র দেশ, যেখানে কোনও মানুষ শৈশব থেকে বিপুল কুসংস্কারের বোঝা সত্ত্বেও জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন হতে শেখে। কুসংস্কারের অস্তিত্ব সেখানে আছে অবশ্যই, কিন্তু তারা ক্রমশ তা নির্মূল করতে পারে। শ্রী রামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, 'ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে পড়ে।'

হিন্দুজাতির সংস্কৃতির মূল ইতিহাস, পৃথিবী আলোড়নকারী মনু প্রভৃতির নীতিশাস্ত্র, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র এবং গীতার অমর বাণী সারা বিশ্বকে ক্লেদমুক্ত করে নবজীবন দানে সক্ষম। এহেন কাজ যে হিন্দুদেরকেই করতে হবে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সজাগ ও সচেতন, কিন্তু পরাধীন জাতির এহেন কাজ কেউ গ্রহণ করবে না। দাসত্ব মুছে ফেলে হিন্দু জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে, এর থেকে পিছিয়ে এলে হিন্দুদের যে কেউ ক্ষমা করবে না সে বিষয়ে সচেতন করে দিয়ে, তিনি বলেছেন চাই 'প্রগ্রেসিভ হিন্দুইজম', ''কল্কির তুরীধ্বনি ইতঃমধ্যেই আমাদের মধ্যে নিনাদিত। আমাদের মধ্যে যা কিছু মহান ও সুন্দর, কৃচ্ছসাধ্য ও বীরোচিত তাকেই সেই রণক্ষেত্রের মধ্যে আহ্বান করছে যেখানে পশ্চাৎ অপসারণের বাদ্য কখনও শোনা যাবে না।"

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাবলী :

১। লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ২। ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ৩। The Complete works of Sister Nivedita--Sister Nivedita Girls School.

প্রেরণাময়ী নিবেদিতা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

জন্মসূত্রে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন আইরিশ, সুতরাং তাঁর স্বদেশচিন্তা আয়ারল্যান্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠারই কথা। কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের জন্য 'নিবেদিতা'। সেইজন্যই ভারতবর্ষকে ঘিরেই তাঁর মায়া-মমতা ও চিন্তা বিস্তৃত হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর স্বদেশ, তাঁর স্বর্গ।

তিনি মনেপ্রাণে ভারতবর্ষকে তার পুরনো গৌরবের দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন, অথবা তিনি প্রচণ্ড আধুনিকা ছিলেন বলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চলমান উৎকর্ষকে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে এক সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেছেন।

তবে তাঁর মনে হয়েছিল, নতুন ভারত গড়তে হলে তাকে আগে স্বাধীন হতে হবে, তবেই শুরু করা যাবে সেই জয়যাত্রা। কিন্তু বিদ্রোহী আয়ারল্যান্ড থেকে তিনি এনেছেন অগ্নিযুগের বাণী— তাই তাঁর পথটা ছিল বিপ্লবের। অবশ্য এই ব্যাপারে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দেরও প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। তিনি স্বামীজীর অগ্নিবাণীই ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে।

এই দেশের বিপ্লববাদের প্রধান স্রষ্টা কিন্তু স্বামীজী। তিনিই ছিলেন অগ্নিযুগের মন্ত্রদাতা। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন— স্বামীজী স্বাধীনতা-সংগ্রামের আগ্নেয় পথের অন্যতম প্রবক্তা— (মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম অফ ইন্ডিয়া, ভূমিকা) স্বামীজী কংগ্রেসের নরমপন্থী আন্দোলন নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর মতে— নেওয়া উচিত ছিল কঠিন সংগ্রামের পথ। তিনি অধ্যাপক কামাক্ষ্যা মিত্রকে বলেছিলেন— দরকার বোমা। শহীদ চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বর্ণমূর্তি দেশের জাহাজঘাটে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ

বারীন্দ্র ঘোষ

বিপিনচন্দ্র পাল

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন— স্বামীজী দেশপ্রেমকে ধর্মে উপনীত করেছেন— (গ্লিম্‌সেস অফ বেঙ্গল, পৃঃ ৭৭)। তাঁর অগ্নিমন্ত্র ছিল 'অভীঃ'। তিনি চেয়েছেন লক্ষ-লক্ষ তরুণের আত্মত্যাগ দেশের জন্য। তিনি চেয়েছেন 'যুবা— আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী'। সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণের থাকবে 'লৌহসদৃশ পেশী' ইস্পাতের ন্যায় স্নায়ু। তাদের শরীরের ভিতরে এমন একটা মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে তৈরী।

তাঁদের ডাক দিয়ে তিনি বলেছিলেন— আগামী পঞ্চাশ বছর অন্য দেবদেবীর দরকার নেই, একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোন দেশমাতৃকা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তখনকার বিপ্লবী তরুণদের সঙ্গে থাকত 'গীতা' আর স্বামীজীর গ্রন্থ। ব্যক্তিগত কথায়ও তিনি কোনও কোনও বিপ্লবীকে বলেছেন--- স্বাধীনতা দরকার, সেটা যে-পথেই হোক।

নিবেদিতা স্বামীজীর সেই বাণীকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। তাঁর 'কালী দ্য মাদার' গ্রন্থটা (এই নামে স্বামীজীর একটা কবিতাও আছে) স্বামীজীর চিন্তার রূপায়ণ বলা চলে। তিনি এই গ্রন্থের মাধ্যমে তরুণ- সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছেন। বিপ্লব-গুরু অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) স্বীকার করেছেন, এরই মাধ্যমে নিবেদিতা তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন দারুণভাবে।

দ্বিতীয়ত, নিবেদিতা তাঁর ভাষণ ও কথাবার্তার মাধ্যমেও বিপ্লব-মন্ত্র ছড়িয়ে দিতেন। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, নিবেদিতা 'ডন্ সোসাইটি'-তেও বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন— (শ্রীঅরবিন্দ, পৃঃ ৪৭২)। তবে এই ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে। ডন্

সোসাইটিতে রাজনৈতিক বিষয় থাকত না বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে, এটা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন নরমপন্থী। তাই মনে হয়, এখানে নিবেদিতা ভাষণ দিতেন জাতীয়তাবাদ নিয়েই— (হরিদাস মুখোপাধ্যায়— উমা মুখোপাধ্যায় জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র, পৃঃ ১৩৬)।

তবে এটা ঠিক যে, তরুণদের কাছে নিবেদিতা আগ্নেয় পথের কথাই বলতেন।। তিনি সম্ভবত গুপ্ত-হত্যাকে মেনে নেননি, কিন্তু স্বাধীনতা যে অহিংসার পথে আসতে পারে না— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

“এই দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা প্রাণবন্যা আনার জন্য তিনি বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে রেখেছিলেন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন প্রেরণা ও সাহচর্য। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটা গভীর জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করা।”

শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁরা নিবেদিতাকে বলতেন— ‘তুমি হবে আমাদের জোয়ান্ অফ আর্ক্। তোমায় আমরা চাই। তোমার পেছনে ছুটবে আমাদের বাহিনী। তুমি হুকুম কর শুধু’ (বংশোদ্ভূত, লিজেল বের—নিবেদিতা, অনুঃ নারায়ণী দেবী, পৃঃ ৪৩২)। নিবেদিতার সেই সব জ্বালাময়ী কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন সংগ্রামী তরুণরা।

তৃতীয়ত, ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে কলকাতায় এসেছেন। তিনি নিবেদিতার সঙ্গে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীকে একত্রিত করে কাজ করা। তিনি জানিয়েছেন, ব্যারিস্টার পি. মিত্রকে সামনে রেখে তিনি কাজ শুরু করেন। তার জন্য একটা কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরী করা হয়—তাতে নিবেদিতাও ছিলেন— (এ বি ইরানী—লাইফ অফ শ্রী অরবিন্দ, পৃঃ ৬৭)। বারীন্দ্রকুমারও জানিয়েছেন, নিবেদিতা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ‘যুগান্তর’ ও ‘বন্দেমাতরম্’ পত্রিকা তখন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র প্রচার করে চলেছে। মাদ্রাজের তিরুমল আচার্য নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন ‘বালভারত’ পত্রিকা সম্পাদনার জন্য (মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত—বিপ্লব সাধনায় নিবেদিতা পৃঃ ২৩৭) ।

নিবেদিতা বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁদের মা-কে সমবেদনা জানিয়ে এসেছেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজীর অনুজ) জামিনের আদেশ পেয়েছিলেন— টাকার জোগান দিয়েছেন নিবেদিতাই। শ্রী অরবিন্দকে যখন সরকার গ্রেপ্তার করার কথা ভেবেছে, নিবেদিতাই তাঁকে সরে যেতে বলেছেন, শ্রী অরবিন্দ আশ্রয় নিয়েছেন পন্ডিচেরীতে।

অবশ্য প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা মনে করেন, নিবেদিতার সঙ্গে বাংলার বিপ্লবযুগের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ ছিল ছিল শুধু— তিনি প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না— (ভগিনী নিবেদিতা, পৃঃ ২৯২)। সেটা হয়তো ঠিক। কিন্তু তিনি নেপথ্যে থাকলেও বিপ্লববাদের সঙ্গে ছিলেন। এই প্রশ্নও উঠেছে, তিনি সেই আগ্নেয়যুগের সঙ্গে থাকলে, পুলিশ তাকে ধরেনি কেন? তার উত্তরে বলা যায়, তিনি কোনও ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার মতো কূটবুদ্ধি ও কৌশল তাঁর মধ্যে যথেষ্টই ছিল— (শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ‘নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন’, দেশ, ৬.৭.৮২)।

আলিপুর বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ অসামান্য কৃতিত্বে অরবিন্দ ঘোষকে মুক্ত করেছেন— কৃতজ্ঞ নিবেদিতা তাঁর কোটের পকেটে ফুল গুঁজে দিয়েছেন তখন—(যোগেশচন্দ্র বাগল— ভারতের মুক্তিসন্ধানী, পৃঃ ২০৫) আর শ্রী অরবিন্দ যখন পন্ডিচেরী যাত্রা করেন, গাড়িভাড়া নিবেদিতা দিয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে নিয়ে--- (মণি বাগচি— নিবেদিতা, পৃঃ ২৮৪)। আরও নানাভাবে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দিকেও পুলিশের নজর ছিল। তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষতি হবে ভেবে অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে মিশনের কাজ অথবা বিপ্লববাদ--- যে-কোনও একটাকে বেছে নিতে বললে তিনি প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মিশন থেকে সরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি শুধু ‘নিবেদিতা অফ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।’

কিন্তু শুধু বিপ্লববাদের দিক থেকে নয়, তিনি ভারতবর্ষের সেবা করতে চেয়েছেন সর্বতোভাবেই। তিনি শুধু জন্মসূত্রে বিদেশিনী— মমতা, সেবা, ত্যাগ ও প্রীতিতে তিনি ছিলেন ভারত-ললনা।

তিনি ভারতের মুক্তির জন্য তো বটেই, তার সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি জানতেন— দুর্গতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে দরকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার। আরও দরকার দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উল্লেখ। এই কারণে তিনি যেমন ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র অবমাননায় ফুঁসে উঠেছেন, তেমনি স্থান করে নিয়েছেন সংস্কৃতির কর্মকেন্দ্রেও।

লর্ড কার্জন একটা বক্তৃতায় ভারতবাসীকে মিথ্যেবাদী বলে নিন্দিত করেছিলেন। নিবেদিতা সব শুনে কার্জনেরই একটা মিথ্যাচার তুলে ধরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে একটা চোস্ত প্রতিবাদপত্র লিখিয়েছেন। হাইকোর্টের জজ গুরুদাস ব্যানার্জীর নামে লেখাটা ছাপা যায়

না, বিশেষ করে— তাঁর ওপর রাজরোষ নেমে আসতে পারে— তাই নিবেদিতা তাঁর নিজের নামে লেখাটা ছাপানোর জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষকে দিয়ে এসেছিলেন। রাজরোষকে ভয় পাওয়ার মতো নারীই তিনি ছিলেন না।

এই দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা প্রাণবন্যা আনার জন্য তিনি বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে রেখেছিলেন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন প্রেরণা ও সাহচর্য। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটা গভীর জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করা। রমেশচন্দ্র দত্ত, ডঃ যদুনাথ সরকার, ডঃ করেছেন। তিনি ইতিহাস চর্চায় বিলেতী সূত্রের বদলে সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সি তথ্য অনুসরণের কথা ডঃ যদুনাথ সরকার, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জীদের বলেছেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন, পাণ্ডুলিপি তৈরীতে সাহায্য করেছেন, (প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা— সিস্টার নিবেদিতা, পৃ. ২৩৭)। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোতে যাতে স্যার জগদীশচন্দ্রের আবিস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। নিবেদিতা বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন। যখন 'বসু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন উৎসাহ, গিরিশচন্দ্র ঘোষকে তিনি নতুন নাটক লেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন বারবার। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের একটা গ্রন্থ তিনি দেখে গিয়েছেন।

এক কথায় বলা যায়— তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধকে নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছেন— (যোগেশচন্দ্র বাগল—জাগৃতি ও জাতীয়তা, পৃ. ২৬৪)।

স্বামীজীর একটা কথা আছে— 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' নিবেদিতার প্রাণবিন্দুও নিহিত ছিল ভারতবর্ষের মঙ্গল ও

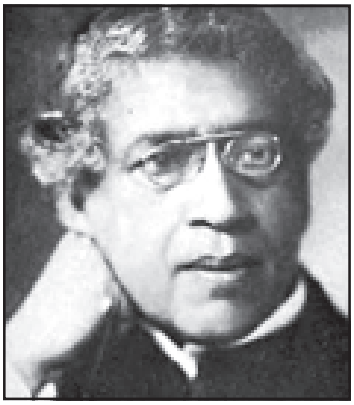

জগদীশচন্দ্র বসু

গিরিশ ঘোষ

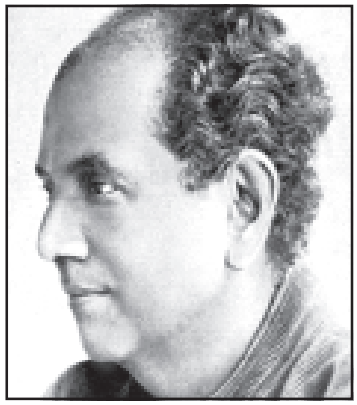

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, গিরিশ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। জগদীশচন্দ্র যেমন তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন গবেষণার প্রেরণা, তেমনি অবন ঠাকুরকে তিনি উৎসাহিত করেছেন চিত্রকলায় নবযুগ আনার ব্যাপারে--- এভাবে এসেছে ভারত-শিল্পের নব্যধারা। নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার প্রমুখ তরুণ শিল্পীর তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য অজন্তায় পাঠিয়েছেন, নিজে গিয়েও তাঁদের কাজ দেখে উৎসাহিত বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জগদীশচন্দ্র তাঁর কথা বারবার মনে করেছেন— (গৌরাঙ্গ মহারাজ— ভগিনী নিবেদিতা, পৃ. ৭২)। মন্দিরের দ্বারে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজও রয়েছে দীপ হয়ে, এক নারীমূর্তি। 'ডন্ সোসাইটি'র মাধ্যমে তিনি যেমন জাতীয়তাবাদের প্রচার করেছেন, তেমনি উৎসাহিত করেছেন মনীষী ও তরুণদের (বিনয় সরকারের বৈঠকে, পৃ. ১০-২১)। নেতা ও বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পালের মনে হয়েছিল— নিবেদিতা ভারতপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমা, তাঁর মধ্যে যেন ছিল Self-consuming passion for India — (দ্য সোল্ অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ৩২)।

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সমৃদ্ধি-চিন্তায়। এর জন্য সমগ্র জীবনই উৎসর্গ করেছিলেন। এই দেশই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি একটা যুগকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন।

ভারতবর্ষের সেই দুর্গতির দিনগুলোতে তাঁর মতো একজন নারীর বড় দরকার ছিল। স্বামীজী এই কথা তাঁকে আকারে-ইঙ্গিতে বহুবার বলেছেন, শেষে চিঠিতে লিখেছেনও। সেই দিন থেকে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে তাঁর স্বদেশ— স্বর্গ বলে মেনে নিয়েছেন, তার সুখদুঃখকে নিজের করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষের মুক্তি, তার অধ্যাত্মচেতনা, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও স্বদেশ-সংস্কারে নিবেদিতা তাই নিয়েছিলেন এক অনন্য ভূমিকা।

১৮৯৮ সালে কাশ্মীরে জয়া, ধীরামাতা, স্বামীজী ও নিবেদিতা।

ভারতীয়ত্বে ভাস্বর ভগিনী নিবেদিতা

ডঃ স্বরূপ ঘোষ

একদিন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ছাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, ''ভারতবর্ষের রাণী কে?'' সমস্বরে উত্তর দিল বিদ্যার্থীরা, ''মহারানি কুইন ভিক্টোরিয়া''। সাধ্বীর মতো তাঁর ছাত্রীদের ভুল শুধরে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''ভারতবর্ষের চিরকালের রাণী সীতা।'' বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে বৈদিক মন্ত্রে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন সেই যজ্ঞের অন্যতম যাজিকা। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যেমন স্বামীজী আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, জন্মসূত্রে বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষকে তিনি অনেক ভারতবাসীর চেয়েও বেশি ভালোবেসেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। ভারতবর্ষের নাম তিনি জপ করতেন, তাই শ্রীশ্রীমা সারদামণি তাঁকে চিনতে পেরে বলেছিলেন, ''নিবেদিতা এখানকার, কেবল তাঁর (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব ও বার্তা ওদেশে প্রচারের জন্য ওদেশে জন্মগ্রহণ করেছিল।''

২৬ মার্চ ১৮৯৮ দীক্ষান্তে স্বামীজী নিবেদিতাকে দিয়ে শিবপুজো করালেন, পরে তথাগত বুদ্ধের চরণে অঞ্জলি দেওয়ালেন এবং বললেন, ''যাও, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের আগে পাঁচশোবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো।'' বিবেকানন্দের পদপ্রান্তে বসে নিবেদিতা চিনতে শুরু করলেন ভারতবর্ষের চিরন্তন মহিমান্বিত রূপটিকে, বুঝতে শিখলেন ভারতীয়দের দুর্বলতাকে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মস্থ করলেন বিবেকানন্দের সেই অমৃতবাণী— ''কিছু নষ্ট কোরো না। ধ্বংসবাদী সংস্কারকরা জগতের কোনও উপকারই করতে পারে না।''

ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন নিবেদিতা। বেদ-উপনিষদের বাণীতে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস এবং সেই গৌরবময় অতীতই যে ভবিষ্যৎ ভারতকে পথ দেখাবে—

এ কথা তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন। ১৯০২ সালে নাগপুরের মরিস কলেজের এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সভানেত্রী হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করার পর বলেন, ''দশেরার সময় যখন অস্ত্রপূজা করতে হয়, দেবী দুর্গার আরাধনা করে শক্তিকে আহ্বান করতে হয়, সেই সময় এক বিদেশি খেলা নিয়ে ছাত্রদের মাতামাতি করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।'' নিবেদিতা ছাত্রদের কাছে দাবি করলেন পরদিন ছাত্ররা যেন তাঁকে তরবারি খেলা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে।' এভাবেই তিনি এক পরাধীন জাতির হৃদিমন্দিরে 'স্বাভিমান' জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন আর দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ঋক্‌মন্ত্রে।

নিবেদিতা ভারতবর্ষের বৈদিক অতীত আর পশ্চিমের বিজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। তাই ভারতবর্ষের উত্থানের জন্য স্বামীজী যে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের শুভ শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে তার শাশ্বত প্রকাশ ঘটেছিল। কারণ তিনি ছিলেন বৈদিক ঋষি, তার ধীশক্তি ও প্রতীচ্যের আধুনিক জ্ঞান ও মেধার ঘনীভূত রূপ। স্বামীজী ভারতবর্ষে গবেষণার বিকাশের মাধ্যমে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সময় জামসেদজি টাটাকে যখন প্রতিকূল বৃটিশ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল, তখন ভগিনী নিবেদিতা টাটার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। এছাড়াও বহির্বিশ্বের শিক্ষাবিদদের দিয়ে বৃটিশ সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন যাতে ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের চেষ্টা সফল হয়।

ভগিনী নিবেদিতার ছিল প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের মতো হিমালয়প্রীতি। তাই ঈশ্বর সাধনার টানে বারবার তিনি গিয়েছেন গিরিরাজ দর্শনে। একবার তুষারশৃঙ্গের অপূর্ব রূপের বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন, ''ওই যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি— উহাই শিব, আর উপরিস্থিত আলোক সম্পাতই জগজ্জননী।'' নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল মহাদেবের আরাধনার মাধ্যমে সদামুক্তভাবে উপলব্ধির এবং তন্মধ্যে মুক্তির স্বরূপ দর্শনের। এতো বৈদিক ভারতবাসীর চিরন্তন আকুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা অনেক পশ্চিমী সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন ভারতীয়ও অনুভবে অক্ষম।

আজ যখন ভারতীয়ত্বের পথ হয়ে আমরা বিশ্ব-নাগরিকত্বের পথে হাঁটতে শিখছি তখন নিবেদিতার ভারতীয়ত্বের প্রাণকেন্দ্রে যে বৈদিক ঋষি তার মাধুর্য ছিল তাকে সাধনার মধ্যে দিয়ে বুঝতে হবে। যে সনাতন দর্শন বিশ্ব নাগরিকত্বের পাঠ দেয় তাঁকেই হেয় করার মধ্যে এক বিকৃত আনন্দ অনুভব করার নতুন শিক্ষায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছি। মুসলমান যদি 'আমি হিন্দু' একথায় মন্দ ভাবে তাই আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই আমি 'বিশ্বনাগরিক' এটাই বলতে শেখানো হচ্ছে। কিন্তু সনাতনী হিন্দু থেকেও কিভাবে বিশ্বনাগরিক হওয়া যায় তার পাঠ নিবেদিতাকে দেখে শেখার সময় এসেছে। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে আর আমরা চিনছি বহুল প্রচারিত পত্রিকার সম্পাদকীয় পড়ে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে! ভারত আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

আমরা Neo-Indians হয়েছি। ভক্তি এখন অতি উদারবাদে, তা যে অনেক সময়

আত্মঘাতী হতে পারে সেকথা জেনেও নির্লিপ্ত হয়ে সমর্থনকারী, শক্তি এখন নগদ নারায়ণে, পাণ্ডিত্যের প্রকাশ উত্তর সম্পাদকীয় পাঠেও বিশ্বসংসারকে সেই জ্ঞান বিতরণে, নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা সব কিছুর মধ্যে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মুসলমানদের গুণকীর্তনে। বিশ্বের মুসলমান ধর্মের ধ্বজাধারীরাও মাঝে মাঝে চমকে উঠবেন যদি আমাদের বিবিধ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের দলদাস প্রাবন্ধিকদের সব লেখা পড়েন। কারণ তাঁদের পেট্রো-ডলারের কি অসম্ভব প্রভাব ভারতীয় মিডিয়ার একাংশের উপর পড়েছে তা জেনে তাঁরা ধন্য হবেন। তাই নিবেদিতার প্রতি সত্য শ্রদ্ধার প্রকাশ হবে যদি আমরা তাঁর ভারতপ্রেমের মূলে যে দর্শন সেই শাশ্বত সনাতন বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি। যে দর্শন সকলের মধ্যেই শিবত্বের বিকাশের কথা বলে যেখানে সংকীর্ণতার স্থান নেই। কিন্তু অতি উদারতার মানে এই নয় যে নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে দিতে সর্বসময়ে রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ নিরপেক্ষতার ছলনায় পরিবেশন করতে হবে। এই ছলনার মিথ্যাচার থেকে নিবেদিতার আদর্শে বলীয়ান হয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

স্বামীজীর কাছে যে ত্যাগের মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা, সেই মন্ত্রকে উপলব্ধি করে তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষই তাঁর জন্মভূমি। এই পবিত্র ঋষিভূমিতেই দেবীসাধনার আসনে তিনি দেশমাতৃকার পুজো করেছিলেন। তাঁর আরাধনায় জগন্মাতার সঙ্গে ভারতমাতার কোনও পার্থক্য নেই। নিবেদিতা তাঁর আত্মনিবেদনের নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করেছেন ভারতমাতার এবং সেবা করেছেন ভারতবাসীর। নিবেদিতার আদর্শে আমরা আজও রাঙাতে পারিনি নিজেদের, পারলে ভারতবর্ষের চালচিত্র স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরে অন্যরকম হোত।

স্বামীজী বলতেন, ''ভারত আবার উঠবে, জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয় পতাকা নিয়ে নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে— সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে, অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।'' তাই নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ হোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগের শক্তিতে বলীয়ান, বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি অন্তর থেকে চাইতেন যে ঋষিভূমি, দেবভূমি এই ভারতবর্ষ আবার বেদবাণীর ধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। আমাদের দেশ গঠনের প্রচেষ্টায় ফাঁকি থেকে গিয়েছে, এ আমাদের অক্ষমতা কিন্তু আদর্শ আমাদের সামনেই ছিল, আমরাই তা অনুধাবন করতে পারিনি, নিবেদিতার পবিত্র জীবন আমরা অনেকেই পড়েছি কিন্তু আত্মস্থ করতে পারিনি। তাই তো আজ ভারত বিশ্বের দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ হোক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ত্যাগের শক্তিতে বলীয়ান, বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষিত ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি অন্তর থেকে চাইতেন যে ঋষিভূমি, দেবভূমি এই ভারতবর্ষ আবার বেদবাণীর ধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠুক।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভোগবাদ ও আত্ম-সর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে নিরীশ্বরবাদী মধ্যপন্থী শক্তি। ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর হয়ে গুণ গেয়েছে সরকারের প্রসাদ প্রাপ্ত তথাকথিত স্বনামধন্য লেখককুল বুদ্ধিজীবী ও বাজারী পত্রিকার কলমচিরা। যার বিষময় পরিণতি দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুঠ হয়ে সুইস ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। একটা ব্যাঙ্কেই এই পরিমাণ বেনামী বেআইনী অর্থ আছে। অন্যান্য বিদেশি ব্যাঙ্কে জমা অর্থের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়! এই অর্থ ভারতে এলে ভারত বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির অন্যতম আর থাকে না। মধ্য আয় সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অধ্যাত্মবাদকে অবহেলা করে যে পাপ দীর্ঘ ৬৪ বছর মধ্যপন্থী নিরীশ্বরবাদীদের কথা শুনে আমরা করেছি আজ তাই মহীরুহ হয়ে আমাদের সর্বস্ব গ্রাস করার উপক্রম করেছে।

তাই নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর মাতৃভাবটিকে বুঝতে হবে। অধ্যাত্মবাদে বলীয়ান হয়ে তিনি নিজ জীবনকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে মাতৃভাবের শুভ প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর মধ্যে সার্থক করে তুলেছিলেন তাঁর গুরুর ইচ্ছা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানদের কাছে তুমি একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু হয়ে ওঠো।'' নিবেদিতার মধ্যে আমরা পেয়েছি সেই মাতৃরূপী শুভানুধ্যায়িনীকে। তাই ভারতীয়ত্বে ভাস্বর মঙ্গলময়ী এই ভগিনীকে শ্রদ্ধা জানাতে হলে তাঁর এই রূপটিকে বুঝতে হবে, কল্যাণকামী কার্যে নির্লোভভাবে এগিয়ে এসে অধ্যাত্মবাদে বলীয়ান হয়ে বৈদিকধর্মে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে নিজের মধ্যে শিবকে ও জীবের মধ্যে চৈতন্য উপলব্ধি করে দেশসেবায় যুক্ত হয়ে আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই নিবেদিতাকে প্রণাম জানাতে হবে। তবেই সে প্রণতি হবে সত্য ও সার্থক।

প্রয়াণের শতবর্ষে ভারতের নিবেদিতা

আশিস গঙ্গোপাধ্যায়

পাদরি স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেলের কন্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর আয়ারল্যান্ডের গনগ্যানন নামে এক ছোটো শহরে। মার্গারেটের মায়ের নাম ছিল মেরী ইসাবেল। ১০ বছর বয়সে মার্গারেট পিতৃহীন হলে তাঁর দাদামশায় হ্যামিলটনের অভিভাবকত্বে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যে হ্যামিলটন ছিলেন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পুরোধা পুরুষ। ছোটোবেলা থেকেই মার্গারেটের মধ্যে পিতৃ এবং মাতৃ উভয়কুলেরই প্রভাব কাজ করেছিল অর্থাৎ ধর্মের প্রতি অনুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ।

মার্গারেটের লেখাপড়া মূলত চার্চের অধীনে লন্ডনের এক বোর্ডিং স্কুলে। সেখানে ছিল নিয়মশৃঙ্খলার কঠোরতা, যা তাঁর চরিত্র গঠনে পরবর্তীকালে খুবই সহায়ক হয়েছিল। মেধাবী মার্গারেট স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্য তালিকার বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর লেখাপড়া করতেন। তার মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এবং বিজ্ঞান সবই ছিল। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষয়িত্রী জীবন শুরু। উইম্বলডনের একটি স্কুলে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রদান অচিরেই প্রশংসিত হতে শুরু করে। এই সময়ে তিনি নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধও লিখতে আরম্ভ করেন। ফলে লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়।

বাস্তব জীবনে তিনি সফল হলেও চার্চের অধীনে প্রথাগত ধর্মীয় জীবন কিন্তু তাঁকে সঠিক শান্তির সন্ধান দিতে পারেনি। তাই কোথায় সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি তার জন্য একটা খোঁজ বা আকুতি তাঁর মধ্যে অবিরত কাজ করছিল। এমন সময়েই তাঁর জীবনে ধ্রুবতারার মতো আবির্ভাব স্বামী বিবেকানন্দের। পরম শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী প্রয়াত স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থ এবং অন্যান্য প্রচলিত মত থেকে জেনেছি যে ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর এক ভক্তের গৃহে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করছিলেন তখন সেই গৃহেই মার্গারেটের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ এবং ভারতীয় সন্ন্যাসীর ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন মার্গারেট। কিন্তু ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিমাইসাধন বসুর একটি লেখায় দেখেছি ''নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজির প্রথম পরিচয় নভেম্বর (১৮৯৫) মাসের পূর্বেই

হয়েছিল মনে করার প্রধান কারণ হলো— ইংল্যান্ডের বিডিং শহর থেকে লেখা একটি চিঠি। চিঠির তারিখ ৪ অক্টোবর। স্বামীজি লিখেছেন, 'স্নেহের মার্গারেট, পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। আমার ভালবাসা জানবে। ইতি বিবেকানন্দ' (পত্রাবলী পৃ. ৩৭৫)।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাস বা তার দু-এক মাস আগে যবেই হোক ভারতীয় সন্ন্যাসীর ধর্মব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। তথাপি তিনি কিন্তু প্রথমেই স্বামীজির সব বক্তব্য অভ্রান্ত বলে মেনে নেননি। লন্ডনে স্বামীজির বিভিন্ন বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তরের আসরে মার্গারেট উপস্থিত থেকে নানা প্রশ্নের উত্তর স্বামীজির কাছ থেকে পেয়ে তাঁর সমস্ত সংশয়ের অবসান হয়েছিল। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দিশেহারা ভাব দূর হলো। মার্গারেট ভারতীয় সন্ন্যাসীকে গুরু হিসাবে বরণ করে নিলেন। এ যেন স্বামী বিবেকানন্দের তাঁর নিজের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকেই নানা সংশয় এবং প্রশ্নোত্তরের পর মেনে নেবার কথাকেই মনে করায়।

স্বামী বিবেকানন্দও ক্রমে মার্গারেটের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, দৃঢ়তা এবং তাঁর মানবদরদী মনের পরিচয় পেলেন। তিনি ভাবতেন, ভারতবর্ষকে যদি জাগাতে হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এবং নারীর অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আর নারীদের অবস্থার উন্নতির প্রধান উপায় তাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। এই কাজে স্বামীজির বিশেষ উপযুক্ত মনে হয়েছিল মার্গারেটকে। তিনি তাঁকে ভারতে গিয়ে বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের কাজে আহ্বান জানালেন।

মার্গারেট তাঁর স্বদেশ, আত্মীয়-বন্ধু এবং প্রতিষ্ঠিত জীবন সবকিছু ছেড়ে স্বামীজির আহ্বানে ভারতে এসে পৌঁছলেন ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি। এখানে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মা সারদাদেবীর দর্শন পেলেন। জননী সারদাও পরম মমতায় বিদেশী আইরিশ কন্যাকে আপন করে নিলেন। আর মার্গারেটও মায়ের আদরের ''খুকি'' হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। সে সময়ের রক্ষণশীল সমাজে এক শ্বেতাঙ্গ ''ম্লেচ্ছ তরুণী''-কে কন্যারূপে গ্রহণ করে নিজের বাড়িতে রাখা যে কত দুঃসাহসিক কাজ তা আজ বোধহয় চিন্তা করাও কঠিন। আর জননী সারদা নিঃশঙ্কচিত্তে সে কাজটিই করেছিলেন। তার কিছুদিন পরেই স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নামকরণ করলেন নিবেদিতা। যেন ভারতের সব কিছুকে আত্মিকভাবে গ্রহণ করে এদেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করতেই তাঁর আগমন। দীক্ষান্তে প্রথমেই স্বামীজি তাঁকে নির্দেশ দিলেন মহামানব বুদ্ধের মত মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে আর আজীবন কঠোর সংযম অবলম্বন করতে।

নিবেদিতার সকল কাজের পেছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সদাজাগ্রত, সতর্ক এবং সস্নেহ দৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছায় ভারতের জাতীয় আদর্শে নারী শিক্ষার কাজ শুরু করার জন্য নিবেদিতা যখন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব কিছু লোকের সামনে নিয়েছিলেন তখন সেই স্কুলে প্রথম ছাত্রী কোথা থেকে আসবে, কে-ই বা তাঁর মেয়েকে ''ম্লেচ্ছ'' দিদিমণির স্কুলে পাঠাবেন সেই বিষয়ে সকলে চুপচাপ ছিলেন। সবার পিছনে কখন যে স্বামীজি এসে বসেছেন তা নিবেদিতাও লক্ষ্য করেননি। স্বামীজি ফিস ফিস করে কয়েকজনকে বললেন, তাঁদের নিজেদের মেয়েদের নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পাঠাবার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে। তারপরও যখন কেউ কিছু বলছেন না, স্বামীজি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ''মিস্ নোবেল, এই হরমোহনবাবু ওঁর মেয়েকে আপনার স্কুলে পাঠাবেন''। স্বামীজির কথা শুনে আনন্দে শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র চার বছর নিবেদিতার স্কুল এবং তাঁর অন্য সব সমাজসেবামূলক কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য জীবিত ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর নিবেদিতার কাজকর্ম করা যে ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ হিসাবে মিশন থেকে যা জানানো হয়েছিল তা হলো ভারতে আসার পর সেখানে বসবাস করে নিবেদিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এদেশে বৃটিশ শাসনের নামে শোষণকে। ইংরেজ জাতির হাতে ভারতবাসীর অপমান এবং নিপীড়ন তাঁকে ব্যথিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলত। তাঁর মনে হোত ভারতের উন্নতির সব থেকে বড় বাধা দেশের পরাধীনতা। এখানকার মানুষের দুর্বলতা এবং নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী বিদেশী শাসন। ভারতকে সেই বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক রাখা চলে না। যেহেতু সে সময় নিবেদিতার পক্ষে রাজনীতি ত্যাগ করা সম্ভব নয় তাই অন্তরে কষ্ট নিয়েও তাঁকে মঠ ও মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়েছিল।

তাঁর গুরু প্রয়াত, মঠ ও মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিন্ন। একমাত্র আশ্রয়স্থল জননী সারদার ভরসা আর অনুপ্রেরণা। সেই সময়ে তাঁর সকল কাজে মা সারদা তাঁর জননী রূপের সব মাধুর্য দিয়ে নিবেদিতাকে সিঞ্চিত করেছিলেন। তাই নিবেদিতা শুধু 'ভগিনী' হয়ে ওঠেননি, হয়ে উঠেছিলেন 'লোকমাতা'। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার ওই মাতৃরূপ দেখেই তাঁকে বন্দিত করেছিলেন 'লোকমাতা' বলে।

স্বামীজির সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ছিল পিতার সঙ্গে মানসকন্যার মতো। আবার গুরুর সঙ্গে শিষ্যার মাঝে মাঝে মতবিরোধও হোত। যেমন নিবেদিতা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করে তাঁর নিজের কোষ্ঠী বিচার করিয়ে জেনেছিলেন যে তাঁর আয়ু ৪৪ বছর। বিবেকানন্দ কিন্তু এ সমস্ত কিছু একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। যদিও কাকতালীয়ই হোক বা যে কারণেই হোক, নিবেদিতার আয়ুষ্কাল ছিল ৪৪ বছরই। তাঁর জন্ম ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর। যে কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। ১৯১১ সালের পুজোর ছুটিতে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও লেডি অবলা বসুর সঙ্গে তিনি দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ শরীরকে একটু ভালো করার আশায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে অবশেষে সে বছরের ১৩ অক্টোবর ওখানেই প্রয়াত হন তিনি। তার আগে নিবেদিতা ক্রমেই নিজের স্কুল ছাড়াও নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেন। অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করলেন নিজের শরীর স্বাস্থ্যের কথা না ভেবেই। তাতে স্বামীজিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল যখন ১৮৯৯ সালে ভয়াবহ প্লেগ রোগ কলকাতা শহরে মহামারির

আকার নিয়েছিল। নিবেদিতা তখন যেভাবে প্লেগ নিবারণ ও প্লেগ রোগে আক্রান্ত মৃত্যুপথ যাত্রীদের সেবার জন্য কলকাতার তরুণ সমাজকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ঝাঁটা-বালতি ইত্যাদি নিয়ে নোংরা বস্তিতে গিয়ে নর্দমা ও রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করেছিলেন তা ছিল যেন রূপকথার মতো। তখনকার কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের স্মৃতিকাহিনীতে সে কথার উল্লেখ আছে। একদিন নিবেদিতা ডাঃ করের রোগী দেখবার ঘরের বাইরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। কারণ তিনি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে প্লেগ রোগের প্রকৃত কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে চান। খবর পেয়ে ডাঃ কর ঘরের বাইরে এসে এক বিদেশী মহিলাকে ওইভাবে আর্তের সেবার জন্যে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি যা যা করণীয় তা তো করলেনই এবং নিবেদিতার অনুরোধে বাগবাজারের এক বস্তির নোংরা ঘরে প্লেগে আক্রান্ত একটি শিশুকে দেখতে গেলেন। নিবেদিতাকেও তিনি নিজের জন্য একটু সতর্ক থাকতে বলেছিলেন, যদিও তাতে কোনও লাভ হয়নি। পরের দিন নিবেদিতা নিজের আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করে দিন-রাত শিশুটির সেবায় মগ্ন ছিলেন। ঘরটিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য নিজেই ঘরের দেওয়াল চুনকাম করলেন। ছোট্ট শিশু কন্যাটির মৃত্যু আসন্ন জেনেও তিনি তাকে ছেড়ে যাননি। অবশেষে তাঁর কোলেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। এসব নিয়ে পরে তিনি কলকাতার প্লেগ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন, শুধু সযত্নে নিজের কথাগুলি বাদ দিয়ে।

তখন তো আর বিজ্ঞাপন এত উন্নত ছিল না। ছিল না এখনকার মতো ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থাও। থাকলে হয়তো শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিবেদিতার ওই স্বর্গীয় দৃশ্যের ছবি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে কোলে নিয়ে মা মেরীর ছবির সঙ্গেই তুলনীয় হোত। কলকাতায় প্লেগে আক্রান্ত বস্তির রাস্তায়, ঘরে-ঘরে নিবেদিতার সেবামগ্ন রূপের আলোকচিত্র দেখে চোখের সামনে ভেসে উঠত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সেবাময়ী রূপ। কিন্তু কোনওরকম প্রচার নিবেদিতা পাননি, চানওনি। সতর্কভাবেই প্রচার বিমুখ থেকে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ তিনি জানতেন প্রচারের প্রয়োজনীয়তা। প্রচার না করলে পৃথিবীর মানুষের কাছে অনেক কিছুই থেকে যাবে অজানা। ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর হবে না। এ সবের প্রতিকারেই নিবেদিতা তাঁর বাগ্মিতা এবং কলমকে ব্যবহার করেছিলেন।

ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি, ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সভ্যতার ইতিহাস, এখানকার কৃষ্টির ঐশ্বর্য, ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার, এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, ভারতের চিত্রকলার পুনর্জাগরণ, জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো ঋষিতুল্য মানুষের যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রচার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানের পত্র-পত্রিকায় সে সমস্ত প্রকাশের জন্য সাহায্য করা প্রভৃতি সমস্ত কাজেই নিবেদিতা নিয়েছিলেন এক অগ্রণী ভূমিকা।

নিজের স্কুল, মানুষের সেবা এবং ভারতের সার্বিক কল্যাণ ও জাগরণের জন্য তিনি এমনভাবে মগ্ন ছিলেন যে সামান্য আহার ও বিশ্রামের কথাটাও তিনি ভাবতেন না। এ বিষয়ে তাঁর গুরুর নিষেধও তিনি কানে তোলেননি। কলকাতায় প্লেগ প্রাদুর্ভাবের আগেই বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যার অমনভাবে সর্বক্ষণ কাজে মগ্ন হয়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮৯৮ সালের ২৫ আগস্ট কাশ্মীর থেকে এক পত্রে নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, ''কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলো না যেন। এতে লাভ নেই। সর্বদা মনে রাখবে, কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো, তার তীব্র রশ্মি মানুষের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে। সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক মূল্য আছে বটে, তার বেশি করতে গেলে ওটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।'' নিবেদিতা যে তাঁর গুরুর কথা শোনেননি সেটা কিছুদিন পরে কলকাতায় প্লেগ শুরু হলেই বোঝা গিয়েছিল। কেনই বা শিষ্যা গুরুর কথা শুনবেন? গুরুই তো শেখাচ্ছিলেন নিজেকে কীভাবে নিঃশেষে দান করতে হয়। সে পত্রের মাত্র চার বছরের মধ্যেই স্বামীজি প্রায় 'ইচ্ছামৃত্যু' বরণ করেছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর নিবেদিতা, স্বামীজির অসংখ্য গুরুভাই এবং অগণিত ভক্ত-অনুরাগীদের মনে হয়েছিল তাঁরা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, 'মধ্যাহ্ন সূর্য' কেন অসময়ে অস্তমিত হলো।

নিবেদিতার চলার পথে অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল অর্থসমস্যা। স্কুল গড়ে তোলা এবং অন্যান্য নানা পরিকল্পনা সফল করে তুলতে প্রয়োজন অর্থের। যদিও এ সমস্যার কথা নিবেদিতাকে তাঁর গুরু ভারতে আসার আগেই জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আবার একই সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছিলেন ভয় না পেতে। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকাতে গিয়েছিলেন তখন নিবেদিতা তাঁকে স্কুলের আর্থিক সমস্যার কথা জানালে তিনি লিখেছিলেন, ''ভয় করো না। তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে। আসতেই হবে। আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। ধৈর্য ধরে থাকো, শক্ত ও

“

এক শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী খৃস্টান রমণী হয়ে তিনি ভারতে গিয়ে শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম গ্রহণই করেননি, সেই ধর্মের গুণগানও করেছেন, যেটা তখন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ছিল অসহনীয়। এমন কী ভারতেও তাঁর কাজের তখনও যোগ্য সমাদর হয়নি। তবু তাঁর কাজ থেমে থাকার বদলে গতি আরও বেড়েছিল।

”

নরম— সবই ঠিক ঘুরে আসবে।" তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, "যে মুহূর্তে আমরা উপযুক্ত হব তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে," এটাই বিবেকানন্দের অভয়মন্ত্র এবং সব সাফল্যের চাবিকাঠি।

অবশেষে স্বদেশ এবং বিদেশ থেকে স্বামীজির ভক্ত-অনুরাগীরা কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন ঠিকই, তবে তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। নিবেদিতা তাঁর শিক্ষা এবং সেবা-মূলক কাজের প্রচার এবং স্বীকৃতি তো বহির্বিশ্ব থেকে পাননি বরং তাঁর কাজের প্রতি ছিল সেখানকার এক বিরূপ মনোভাব। এক শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী খৃস্টান রমণী হয়ে তিনি ভারতে গিয়ে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মগ্রহণই করেননি, সেই ধর্মের গুণগানও করেছেন, যেটা তখন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ছিল অসহনীয়। এমন কী ভারতেও তাঁর কাজের তখনও যোগ্য সমাদর হয়নি। তবু তাঁর কাজ থেমে থাকার বদলে গতি আরও বেড়েছিল। তবে প্রাসঙ্গিক বইপত্রের লেখালেখি দেখে মনে হয়, নিবেদিতা কি একটু হতাশ হয়েছিলেন বা তাঁর মনে কি কোনও নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছিল? এবং সেটা কি তাঁর অন্তর্যামী গুরু বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল? বোধহয় সে কারণেই সুদূর আমেরিকা থেকে ১৯০০ সালের ২৬ মে তিনি তাঁর স্নেহের নিবেদিতাকে পত্রে লিখেছিলেন, "আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো এবং কিছুমাত্র হতাশ হয়ো না... দৃঢ় হও মা। কাঞ্চন কিংবা অন্য কিছুর দাস হয়ো না, তবেই সিদ্ধি আমাদের সুনিশ্চিত"। নিজের প্রয়াণের মাত্র কয়েক মাস আগে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে লিখলেন, "যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্ট ভাবে তোমাকেও যেন ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

নিবেদিতা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এক এবং অভিন্ন। তাই তিনি নিজের পরিচয় দিতেন "শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা" বলে।

যতই বলা হোক না কেন, নিবেদিতাকে উপদেশ বা নির্দেশ না দিয়ে বিবেকানন্দের উপায়ও ছিল না। কারণ নিবেদিতা ছিলেন তাঁর সৃষ্টি। তাঁর কর্ম করার জন্যই নিবেদিতার জন্ম, ভারতে আগমন এবং এদেশের সার্বিক কল্যাণে তাঁর আত্মোৎসর্গ।

গুরু বিবেকানন্দের প্রত্যাশা ও নির্দেশ পূর্ণ করেছিলেন তিনি। কোনও ভয়, দ্বিধা, প্রলোভন, বাধা, নিন্দা-সমালোচনা এবং রাজ-রোষ তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। ভারতবর্ষই ছিল তাঁর কর্মভূমি, তাঁর পুণ্যভূমি। সেই মহীয়সী নারী ভারতের নিবেদিতা শুধু জন্মসূত্রে ছিলেন বিদেশী অন্য সব অর্থে তিনি এদেশী, এমনকী লোকান্তরিতও ভারতের মাটিতে। তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করে আমরা নিজেরাই ধন্য।

সুরেন গাঙ্গুলি ও নন্দলাল বসুর কলমে বোসপাড়া লেনের সেই মহান তীর্থক্ষেত্র, নিবেদিতার আবাসস্থল।

সুমহান সেবাব্রতী ভগিনী নিবেদিতা

অর্ণব নাগ

'তোমার (নিবেদিতা) মধ্যে আছে জগৎ আলোড়নকারী শক্তি— এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চয়। তোমার পিছনে অন্যরাও আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী এবং তারও চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ! ওঠ, জাগো! জগৎ যে দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে— তোমার কি নিদ্রা সাজে?'

—স্বামী বিবেকানন্দ

না, এই পরিস্থিতিতে নিদ্রা সত্যিই সাজে না। পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করার জন্য চোখ বোলানো যাক ৮ মে, ১৮৯৮-এর পুণের 'মরাঠা' পত্রিকা'র প্রতিবেদনের দিকে : 'কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ভয়ানক বিভীষিকা'র অবস্থা চলছে। বহু বৎসর এ জিনিস কলকাতায় দেখা যায়নি। আট লক্ষ লোকের ওই বিরাট জনসমুদ্র যেন সহসা ভয়াবহভাবে সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত হয়ে উঠেছে। শহরের বাইরে পালাবার জন্য প্রচণ্ড ব্যস্ততা— সাধারণ যানবাহন দ্বারা ওই বিপুল জনসংঘকে পাচার করা সম্ভব নয়। ট্রেনে, স্টীমারে, পথে— শুধু দেখা যায়, বিপুল প্রবাহিত জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের জন্য দু' লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে গেছে। কিছু ধনী পর্দানসীনা মহিলা পর্দাবন্ধন ফেলে দিয়ে পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে ছুটেছেন— এই মারাত্মক শহর থেকে মুক্তি পাবার জন্য। অবস্থা দেখে মনে হয়, এ যেন বিরাট কোনও সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিচিত্র রূপ!' ঠিক যেন নরককুণ্ড। যার কুণ্ডলিনীর নাম প্লেগ। ইঁদুরবাহিত এই রোগটার ভয়াবহতা সম্পর্কে কোনও ধারণা একবিংশ শতাব্দীতে বসে করা সম্ভব না হলেও, উনিশ শতকের শেষে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব সামাজিক ভয়াবহতাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি তারই মর্মান্তিক প্রমাণ। 'মহামারী' শব্দবন্ধনীটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত রয়েছেন 'প্লেগের প্রাদুর্ভাবে'র গুরুত্ব বুঝতে তাঁদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

প্লেগভীতি যত না, তার চেয়ে বেশি তার জন্য টীকাদানের আতঙ্ক--- কলকাতার প্লেগ-পরিস্থিতিকে সত্যি সত্যিই মারাত্মক করে তুলেছিল। ১৮৯৮-এর পরের বছর ১৮৯৯-তেও প্লেগ উপস্থিত হলো যথাসময়ে এবং আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। ওই বছরের ২৩ মার্চের একটি পত্রে আর্তনাদ করলেন নিবেদিতা, 'কী ভয়ঙ্কর! চারদিকে মানুষ মরছে অথচ কিছু করবার নেই!' কিছু করবার তাগিদেই শেষপর্যন্ত সদ্যগঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে'র তরফ থেকে প্লেগ-সেবায় গঠিত হলো একটি কমিটি। যে কমিটি'র সম্পাদক ও সভাপতি'র যুগপৎ দায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল নিবেদিতাকেই। আর স্বামীজী'র বীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ ছিলেন এর কার্যাধ্যক্ষ। বিবেকানন্দের ইংরেজি জীবনীর বর্ণনা : ''The Ramakrishna Mission

Plague service was promptly initiated on Good Friday, the 31st of March (1899), under Swamiji's instructions, and did considerable work in a well organised way. He himself came to live in a poor house to inspire courage in the people and cheer up the workers. The whole management was placed in the hands of the Sister Nivedita as President and Secretary, the Swami Sadananda as the officer-in-Chief, with the Swamis Shivananda, Nityananda and Atmananda as assistants." স্বামীজী তার আগের বছর-ই আন্তরিক মনোবাসনা প্রকাশ করেছিলেন, ''দেখ, আমরা সকলে ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। মরণভয় তুচ্ছ ক'রে এইসব প্লেগরোগীদের সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধ দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের নূতন মঠের (বেলুড়ে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের) জমিও যদি বিক্রি করে দিতে হয়, আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয়, আমরা প্রস্তুত।" যাই হোক, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩১ মার্চ-ই যথারীতি শুরু হলো প্লেগ সেবার কাজ।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার এই কাজ শুরু হবার পর ২২ এপ্রিল (১৮৯৯) বিডন স্ট্রীটের (অধুনা অভেদানন্দ রোড) ক্লাসিক থিয়েটারে এনিয়ে একটি সভা আয়োজিত হয়। যার মূল লক্ষ্য ছিল, স্বামীজী জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভরসা করেছিলেন, সেই যুবকদের যথেষ্ট সংখ্যায় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে প্লেগ সেবায় আত্মনিয়োগ করানো। এই সভার মূল বক্তা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'প্লেগ ও ছাত্রগণের কর্তব্য'। প্রখ্যাত বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা- গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানাচ্ছেন, '(সেই সভায়) জ্বলন্ত ভাষায় কলকাতার ছাত্রদের পৌরুষকে তিনি (নিবেদিতা) আহ্বান করেছিলেন— দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসী ভাইবোনদের চরম সংকটের দিনে সাহায্য করবার জন্য। নিবেদিতা তাঁর বক্তৃতায় বস্তিসেবার প্রয়াসকে গণ-সংযোগ আন্দোলনে পর্যবসিত করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।' শ্রদ্ধেয় গবেষকের গবেষণার আরও কিছু অমূল্য অংশ : ''সভার মূল বক্তা ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে ছিল আগুনের ভাষা। বর্ণনা করেছিলেন শহরের নরককুণ্ডের মতো বস্তিগুলির কথা, সেখানে কাতারে কাতারে 'আমাদের অসহায় ভাইবোনেরা মরছে।' ''ধিক সেই বস্তির মালিকদের, যারা ওই নরকে মানুষকে বাস করতে বাধ্য করে। ধিক্ সেই পৌরকর্তাদের, যারা বস্তির মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না।" তিনি (নিবেদিতা) স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কথা', যিনি 'ব্রাহ্মণ হয়েও মেথরের পায়খানা পরিষ্কার করেছিলেন নিজের মাথার চুল দিয়ে।"

নিবেদিতার প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা এবং স্বামীজী'র উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণে ছাত্রদের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ জনা পনেরো ছাত্র স্বেচ্ছায় নিবেদিতার সেবাকাজে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বলরাম মন্দিরে সবাই একসঙ্গে কাজের বিবৃতি দিতেন এবং নিবেদিতার কাছে পরবর্তী কাজ বুঝে নিতেন। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে ৫ এপ্রিল (১৮৯৯) প্লেগ সেবা কাজের জন্য অর্থসাহায্যের ব্যাপারে ইংরেজি সংবাদপত্রে নিবেদিতার আবেদন বেরোলে সেখান থেকে যৎসামান্য কিছু অর্থসাহায্যও মেলে। শুধু কথায় নয়, কাজেও তা করে দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এই যোগ্য শিষ্যা। এব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের অনবদ্য সাক্ষ্য : ''প্লেগের সময় কলিকাতায় কি আতঙ্ক!... কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী বিবেকানন্দ ইহাকে লন্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।'' নিবেদিতা'র কানে আসলে ততক্ষণে বাজতে শুরু করে দিয়েছে তাঁর গুরুর অমোঘ আহ্বান— ''ভবিষ্যত ভারত-সন্তানদের কাছে তুমি একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু হয়ে ওঠো।"

নিবেদিতার সেবাকার্যের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ ধরা পড়েছে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের স্মৃতিচারণায়, ''১৮৯৯ খৃস্টাব্দে প্লেগ সংহারকরূপে দেখা দেয়। পূর্ব-বৎসর তাহার আবির্ভাব সূচনায়, বিধিব্যবস্থা-বিভীষিকা ভয়ে ভীত জনগণ শহর হইতে পলায়ন করে।... এই বৎসর ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন আশ্বাস দেন, কোনও রোগীকে বলপূর্বক গৃহান্তরিত করা হইবে না।... সেই সময় একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলি-ধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন-প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন। সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোনও বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। আমি বলিলাম, ''রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।" বাগদীবস্তিতে কিরূপে বিজ্ঞান- সম্মত পরিচর্যা সম্ভব, তাহার আলোচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আদ্র-জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুইদিন পরে শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহ তপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।'

এনিয়ে পরবর্তী তথ্য সংযোজনে একটি অশ্রুকাতর দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা : ''মৃত্যুর পূর্বে শিশুটি তাঁহাকেই (নিবেদিতাকে) জননী মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া 'মা', 'মা' করিয়াছিল। তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা বিফল করিয়া এই শিশুটির মৃত্যু তাঁহাকে বিশেষ বিচলিত করে। নিবেদিতার 'স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইষ্টার্ন হোম' নামক পুস্তকে 'প্লেগ' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে প্লেগের

আবির্ভাবে পল্লীর তদানীন্তন অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া এই শিশুটির মৃত্যুর বর্ণনা আছে; নাই শুধু তিনি নিজে মূর্তিমতী করুণার ন্যায় কিরূপে এই সেবাকার্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ।'' সনাতনী রামকৃষ্ণ-আদর্শ মেনে প্রচারের সবরকম আলো থেকে নিবেদিতা নিজেকে লুকোনোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মহান সেবাব্রতের প্রতি অবিচলিত আস্থায় ভগিনী নিবেদিতার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের বাল্বায় রূপ এড়িয়ে যায়নি ডাঃ আর জি করের নজরে। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন, ''এই সঙ্কট-সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তিতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি অপরকে সাহায্য দান করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয়-নির্বাহার্থে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধ-পান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন দুগ্ধ ও ফলমূল-ই ছিল তাঁহার আহার।'

ভগিনী নিবেদিতা'র প্লেগ সেবাকার্যের একটি অনুপম বর্ণনা চোখে পড়ে স্বামী তেজসানন্দের লেখায়— ''মূর্তিমতী সেবা নিবেদিতাও স্বীয় গুরুর (বিবেকানন্দের) অনুবর্তিনী হইলেন এবং কোদালি-সম্মার্জনী হস্তে বাগবাজার পল্লী'র রাস্তাঘাট পরিষ্করণ ও প্লেগাক্রান্ত জনগণের সেবাকার্যে নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। মুগ্ধবিস্ময়ে বাংলার নরনারী দেখিলেন নিকষিত- হেমসদৃশ এক অপরূপ কল্যাণমূর্তি ভক্তি শতদল হস্তে দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট সজ্জিত করিয়া পূজার প্রদীপ জ্বালিয়া দিতেছেন, আর তাঁহার অন্তরে অফুরন্ত প্রেম ও করুণা আর্তজনের প্রাণে অসীম শান্তি ও ভরসা আনিয়া দিতেছে। নিবেদিতা স্বীয় জীবন এই নিষ্কাম জীব-সেবায় উৎসর্গ করিয়া নিবেদিতা নাম সার্থক করিয়া তুলিলেন।'' এ প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান তথ্য সংযোজন করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ''নিবেদিতা প্লেগের সময়ে বস্তিবাসীদের মর্মান্তিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি লিখতে লাগলেন, সাহায্যের আবেদন করলেন, সেইসঙ্গে বস্তিতে-বস্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কি ধরনের কাজ চলেছে, তার বিবরণও দিলেন। তাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে সাড়া পড়ে গেল, অল্পবিস্তর সাহায্য তাঁরা পেলেন,

রোগশয্যায় গোপালের মা ও পাশে উপবিষ্টা ভগিনী নিবেদিতা।

এবং তাঁদের কাজ প্রত্যক্ষে দেখার পরে হেলথ অফিসার ডাঃ নীল্ড কুক, প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ ব্রাইট এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, যা সেকালে কোনও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পাবার কল্পনাও করতে পারত না।'' পরম শ্রদ্ধেয় গবেষক যথার্থই বলেছেন, 'নিবেদিতার সে ভূমিকা (প্লেগ সেবার) পুরাণ-কথার মর্যাদা লাভ করেছে।' তাঁর সাক্ষ্য : ''কলকাতা পুরাণের মহত্তম এক অধ্যায় রচিত হয়েছিল সেদিন রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবার কাজ দিয়ে। কলকাতার ইতিহাসে সেটিই ছিল প্রথম ব্যাপক বস্তি-সেবার কাজ।'' রামকৃষ্ণ মিশনের এই প্লেগ-সেবা কাজে ভগিনী নিবেদিতার পাশে স্বামী সদানন্দের নামও সমোচ্চারিত হবার দাবি রাখে। তবে আলোচ্য বিষয় ভিন্ন হওয়ায় তাঁর সেবাব্রতের অতুলনীয় ভূমিকা-র কথা এখানে আলোচনা করা গেল না।

১৯০৬ সালের জুলাই মাসে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল পূর্ববঙ্গে। ১৮৯৯ সাল অর্থাৎ প্লেগসেবার বছর থেকে ১৯০৬— মাঝের সাতবছরে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ১৯০২ সালে জাগতিক বন্ধন ছিন্ন হয়েছে স্বামীজীর, লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বঙ্গভূমি তখন উত্তাল, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা রাজনীতির সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন নিবেদিতা আর এ নিয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে তাঁর। যদিও আমরা জানি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ সহ স্বামীজী'র অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে নিবেদিতার ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। তবে ওই সাত বছরের ঘটনাপ্রবাহ যতই যেদিকে খুশি বাঁক নিক না কেন, তাতে ভগিনী নিবেদিতার সেবাপরায়ণতার কমতি দেখা যায়নি এতটুকুও। তার আগের বছর-ই (১৯০৫) মস্তিষ্কের জ্বরে (ব্রেন ফিভারে) ভুগে ওঠার পর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর সেবাকাজ— এও পুরাণ-কথা সৃষ্টির দাবি রাখে বৈকি। এর পারিশ্রমিক অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন, স্বীয় শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে বরণ করে নিয়ে! এই অনন্য সেবা-কাজের সুনিপুণ বর্ণনা পাই প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার লেখায় : ''ইতিমধ্যে জুলাই মাসের (১৯০৬) মাঝামাঝি খবর আসিল, পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে বেলুড় মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীকে সেই অঞ্চলে প্রেরণ করা হইল। যতই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বিবরণ আসিতে লাগিল, নিবেদিতা ততই অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি প্লেগের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই বিন্দুমাত্র নিজের জন্য চিন্তা না করিয়া তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া সেপ্টেম্বরের প্রথমেই পূর্ববঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বেই যাঁহারা সেবাকার্যে আসিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাঁহাদের সহিত নৌকায় করিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া সাহায্য

দিতেন। স্বামীজী তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন, 'আমরা যেন প্রত্যেকের সঙ্গে তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি।' নিবেদিতা এই উপদেশ কী সুন্দরভাবে মনে রাখিয়াছিলেন! এই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গকে কেবল ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই নহে, কৃষক-রমণীগণের সহিত আলাপের সময় তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও ঘর-সংসারের কথা তিনি এত গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিতেন যে, তাহারা মনে করিত নিবেদিতা যেন তাহাদেরই একজন। তিনি যে তাহাদের প্রকৃত দরদী ও হিতৈষিণী, এক মুহূর্তে জন্য এ বিষয়ে তাহাদের সংশয় ছিল না। আজ দেশের অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের যে কোনও দুঃখ-দুর্দশায় বহু নারী সভা-সমিতি গঠন করিয়া সেবাকার্যে অগ্রসর হন। সত্যই আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু ১৯০৬ খৃস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে নিবেদিতা কোনও নারীকে সহকর্মীরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। অবশ্য তাহার জন্য দায়ী তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। বলিবার উদ্দেশ্য— নিবেদিতার সাহস ও হৃদয়বত্তা; দেশের যে কোনও বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তিনি সর্বদা-ই প্রস্তুত থাকিতেন, কাহারো জন্য অপেক্ষা করিতেন না। এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ দৃশ্য নিবেদিতার কোমল প্রাণে কী গভীর আঘাত দিয়াছিল, তাঁহার 'Famine and Flood' নামক প্রবন্ধগুলিই তাহার প্রমাণ। বাড়ি বাড়ি ভ্রমণ করিবার কালে দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারগুলির মহত্ত্বও তিনি অনুভব করিয়াছেন। এক পল্লীতে রমণীগণ তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া দিলে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, তাহারা প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে। নিজেদের দুঃখ এবং দুর্দশার অন্ত নাই; তথাপি, নিবেদিতা বুঝিলেন, নীরবে তাহারা অন্তরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছে, 'তোমাদের শান্তি হউক।' নিবেদিতার চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।"

> **"প্লেগের সময় কলিকাতায় কি আতঙ্ক!... কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জাবোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনীই ভগিনী নিবেদিতা।"**

নিবেদিতা'র সেবাব্রত ছিল প্রকৃত অর্থেই একটা 'মিশন'। নিবেদিতা'র একজন খুব শ্রদ্ধার নারী ছিলেন গোপালের মা (অঘোরমণি দেবী)। ১৯০৬ সালের মাঝের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁকে প্রথমে বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে আনা হয়। কিন্তু মানুষের সেবার জন্য যিনি নিজের জীবনটাকেই বাজি রেখেছেন, তিনি যে তাঁর শ্রদ্ধার পাত্রীটিকে নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সেবা করার জন্য স্বীয় বাসভবনে নিয়ে আসবেন এতে আর আশ্চর্যের কী! সুতরাং অচিরেই বলরাম মন্দির থেকে গোপালের মা চলে এলেন নিবেদিতার ১৭নং বোসপাড়া লেনের স্বীয় বাসভবনে। ওই বছরের ৮ জুলাই যখন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন বোধহয় 'নিবেদিতা'রূপী স্বয়ং গোপালের অন্তিম সেবাটুকু গ্রহণ করেই ভারি সুখে স্বর্গারোহণ করলেন গোপালের মা। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, "তাঁহার (গোপালের মা) অন্তিম জীবনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।"

রাতের আহার ফেলে কান্নার রোল ওঠা পাশের বাড়ির সদ্য কন্যা-হারা শোকাতুরা জননীর পাশে যেন তার নিজেরই আরেক মেয়ের মতো দাঁড়ানো, কিংবা শালপাতার ঠোঙায় সাধ্যমত ফল, মিষ্টি দিয়ে নিজের স্কুলের ছাত্রীদের খাওয়ানো অথবা নিজের প্রতিবেশী, অল্প বয়সেই অকাল বৈধব্যের নিষ্ঠুরতা যাঁকে গ্রাস করেছিল, সেই প্রফুল্লদেবীকে প্রত্যেক একাদশীতে নিজের ছোঁয়া বাঁচিয়ে (নইলে জাত যায়!) মিষ্টি ও সরবৎ খাওয়ানো, বা নিজের স্কুলের ছাত্রী মহামায়া যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পুরীতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়েটিকে তার মা এবং ভাই-এর সঙ্গে রেখে তাঁর ও ক্রিস্টিনে'র মেয়েটিকে সুস্থ করতে (যদিও মেয়েটি পরে মারা যায়) অসম্ভব সেবা-শুশ্রূষা— নিজের জীবন দিয়ে ভারতবাসীকে সেবার মর্ম পরতে পরতে অনুভব করিয়ে দিয়ে গেছেন 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা', শ্রীশ্রী মায়ের আদরের 'খুকী', গোপাল-মায়ের 'নরেনের মেয়ে' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা', তাঁকে যাই বলুন না কেন। পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনের সাজানো নৈবেদ্যকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে বাগবাজারের এঁদো বোসপাড়া লেনের দমবন্ধ করা, স্যাঁতস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটি ছোট্ট ঘরে জীবনের অনেকগুলি বছরের বারোমাসই কাটিয়ে নিজের জীবনকে স্বল্পায়ু করে ছাত্রী ও পল্লীবাসী'র 'লোকমাতা' ও 'ভগিনী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা সেবাকার্যের যে সর্বোত্তম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, জগতের ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে বিরলতম নিদর্শন।

ঋণগ্রন্থ :

১. ভগিনী নিবেদিতা : প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

২. বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (চতুর্থ খণ্ড) : শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৩. ভগিনী নিবেদিতা : স্বামী তেজসানন্দ।

৪. রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কলকাতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু (পুরাতনী, উদ্বোধন, বইমেলা ২০০৬) ও এ-সংক্রান্ত কয়েকটি ছোট পুস্তিকা।

মা সারদামণির সঙ্গে একান্তে নিবেদিতা।

কলিকাতা ও স্ত্রীভক্ত পরিবার

ভগিনী নিবেদিতা

প্রথম হইতেই স্থির ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামত, আমি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দিব।...এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য আমি নভেম্বর মাসের প্রথমে একাকী কলিকাতায় পৌঁছাইলাম। স্টেশন হইতে শহরের উত্তর প্রান্তে রাস্তা চিনিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। ...ঘটনাক্রমে, স্বামীজী সেই সময় কলিকাতায় এক বিশিষ্ট ভক্তের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই মাধ্যমে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী 'সারদা দেবী' অথবা ভক্তগণের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্ত্রীভক্তগণসহ নিকটে বাস করিতেন।

আট-দশ দিনের মধ্যেই অতি নিকটে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ঘরেই কাটাইতাম। গ্রীষ্মকাল আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে বিশ্রামের জন্য তাঁহার গৃহেই আসিতাম। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা ছিল। আমার জন্য আর পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল না, অপর সকলের সহিত শীতল ও সাদাসিধা ঘরটিতেই শয়ন করিতাম। পালিশ করা লাল মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তাহার উপর এক-একটি বালিশ ও মশারি।

আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির কর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার কথা সকলেই জানেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পর আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বামী তাঁহার কথা ভুলিয়া যান। পরে মাতার অনুমতি লইয়া পল্লীগ্রাম হইতে পদব্রজে গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলে পতির দাম্পত্য-বন্ধনের কথা স্মরণ হইল। কিন্তু তিনি জীবনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কথা বলিলেন। পত্নীও প্রত্যুত্তরে দৃঢ়তার সহিত তাঁহার ওই জীবনে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করিয়া কেবল শিষ্যার ন্যায় তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার জীবনের এই সকল ঘটনা আমরা পূর্বে বহু বার শুনিয়াছি। তখন হইতে সেই উদ্যানেরই একটি গৃহে বহু-বৎসর তিনি স্বামীর নিকট পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় বাস করেন। একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ।

শিক্ষা-আরম্ভকালে তাঁহার বয়স ছিল অল্প; পরে কথাপ্রসঙ্গে কখনও কখনও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদান কত বিভিন্নমুখী ছিল তাহার উল্লেখ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সব জিনিস গুছাইয়া রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়েও তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন— যেমন প্রদীপ জ্বালিবার সাজ-সরঞ্জাম দিনের বেলায় কোথায় রাখিতে হইবে। কোন বিষয়ে অপরিচ্ছন্নতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং উগ্র কঠোরতা সত্ত্বেও লালিত্য, সৌন্দর্য ও চালচলনে শান্ত-গাম্ভীর্য পছন্দ করিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে এই কালের একটি গল্প শুনা যায়। একদিন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল শিশুর ন্যায় আগ্রহ ও গর্বের সহিত একঝুড়ি ফলমূল শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিলে, তিনি গম্ভীরভাবে উহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ''কিন্তু এত বেশি বেশি কেন?'' অপ্রত্যাশিত নিরাশায় বালিকা পত্নীর সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। ''অন্ততঃ এ-সব আমার জন্য নয়''— এই মাত্র বলিয়া তিনি নীরবে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। নিকটে যে সব বালক বসিয়াছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ''ওকে ফিরিয়া নিয়ে এস। ওকে কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তি পর্যন্ত উড়ে যাবে।''

তিনি তাঁহার এত প্রিয় ছিলেন! তথাপি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তাঁহার আরাধ্য পতির সম্পর্কে কথা বলিবার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া রাখেন— তিনি যেন কেহই নহেন। তাঁহার সকল ভক্তই বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটি বাক্য যে সত্য হইবে, এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমা সম্পদে-বিপদে 'অটল সুমেরুবৎ দৃঢ়'। 'গুরুদেব' 'শ্রীগুরু' বলিয়া তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন, তাঁহার কথাবার্তায় এমন একটি শব্দ কদাপি থাকে না, যাহাতে, 'আমি তাঁহার অমুক' এই বলিয়া কোন আত্ম-অধিকার প্রকাশ পায়। তাঁহার পরিচয় জানে না, এমন কেহ তাঁহার কথাবার্তা হইতে বিন্দুমাত্র অনুমান করিতে পারিবে না যে, উপস্থিত অপর সকলের অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁহার অধিকতর স্বত্ব বা দাবী আছে, অথবা তাহাদের অপেক্ষা তাঁহার সম্পর্ক নিকটতর। মনে হয়, পূর্বের ন্যায় পত্নীর নিষ্ঠাটুকু ব্যতীত পত্নীভাব তাঁহার মধ্য হইতে বহুকাল চলিয়া গিয়াছে— সেখানে আছে শুধু 'আমি শিষ্যা' এইভাব। তথাপি সকলে তাঁহাকে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া থাকেন যে, তাঁহার সহিত একত্র ভ্রমণকালে রেলগাড়িতে কেহই তাঁহার বেঞ্চির উপরের বার্থে আরোহণ করিবেন না। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হইল। তাঁহার উপস্থিতিই সকলের নিকট পরম পবিত্রাস্বরূপ।

আমাদের সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোন নূতন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে। কোনও প্রশ্ন যত নূতন বা জটিল হউক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করিয়া দিতে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস।

(সংক্ষেপিত। উৎস : স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি)

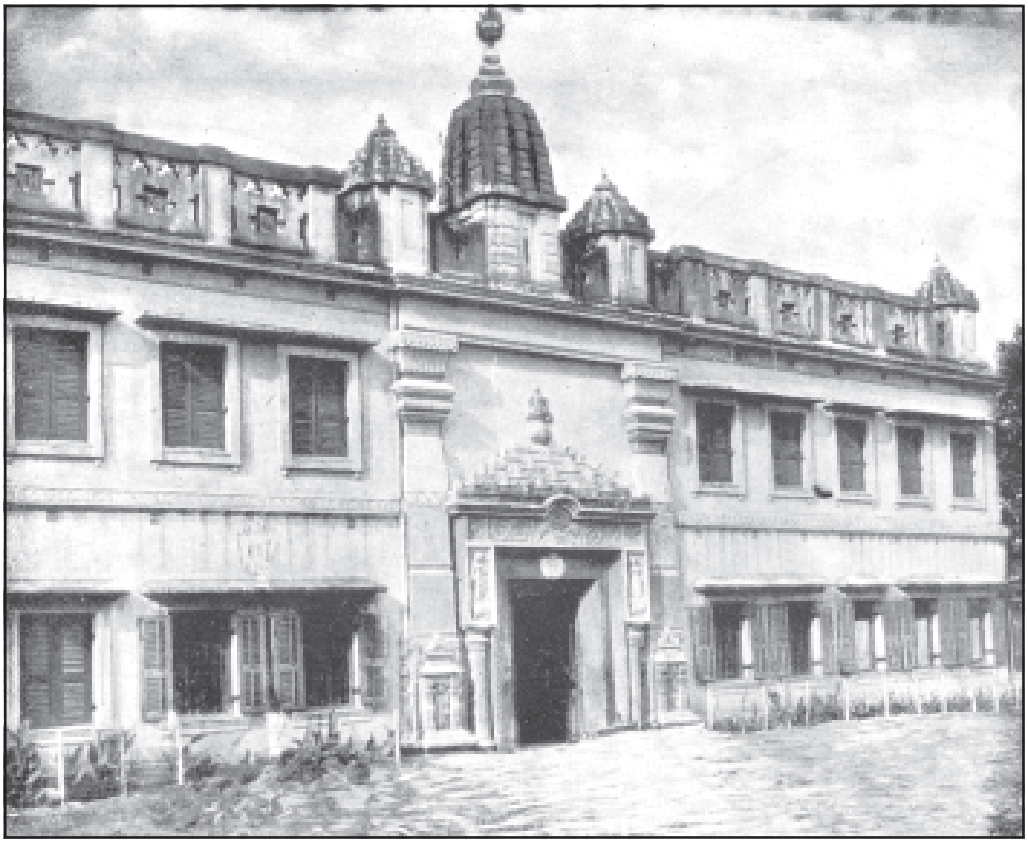

বাগবাজারে নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছবি।

নারী শিক্ষায় নিবেদিতার চিন্তা-চেতনা

বন্দিতা ভট্টাচার্য

২০১১ সালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র শ' দেড়েক বছর আগে বাঙালী সমাজের মানুষেরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা নিয়ে কী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আসলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালী সমাজ মেয়েদের লেখাপড়াকে কখনও ভাল চোখে দেখত না। মেয়েরা যদি পড়াশুনো করে তাহলে হয় বিধবা নয় কুলত্যাগিনী হবে, তার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে, সে কোনওদিন মা হতে পারবে না— এ ধরনের বিচিত্র সব ধারণা তখনকার দিনে চালু ছিল। এইসব অপপ্রচারকে উপেক্ষা করে উনিশ শতকের সচেতন একদল মানুষ মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কিভাবে মেয়েদের শিক্ষিত করা যায় তার জন্য তাঁদের শ্রম ও সাধ্য নিয়োগ করলেন। আবার জনমতও গড়ে তুলতে বিরামহীন তাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশেষে উদার হৃদয় ও মুক্ত মনের অধিকারী কয়েকজন মিলে বারাসতে গড়ে তুললেন মেয়েদের জন্য একটি স্কুল ১৮৪৭ সালে।

যে বছর এই স্কুলের সূচনা সেই থেকেই মানুষের মধ্যে একটা নবচেতনার জাগরণ এল। পরের বছরই ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন সাহেবের এদেশে আগমন ঘটে। এদেশের মেয়েদের শুধু শিক্ষা নয়, অনেক বিষয়েই শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং শিক্ষাই যে পারে সব অন্ধকার দূর করে দিতে এই ধারণায় বদ্ধমূল বেথুন সাহেব মেয়েদের উন্নতির জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দিতে সচেষ্ট হন। সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে তিনি সহযোগিতা প্রার্থনা করে আবেদন জানান। তাঁর এই আবেদনে সেদিন অনেকেই সাড়া দিয়েছিলেন। ফলে ১৮৪৯ এর ৭ মে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়— পরবর্তীকালে এটি বেথুন স্কুল নামেই পরিচিত হয়।

আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য একজন বিদেশী বেথুন সাহেবের যেমন অবদান স্মরণযোগ্য তেমনই একজন বিদেশিনী মিস মার্গারেট নোবেল এর অবদানও নিঃসন্দেহে

স্মরণীয়। আইরিশ দুহিতা মার্গারেট নোবেল স্বামী বিবেকানন্দের মানসককন্যা রূপে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন। তিনি শুধু বাংলার নন— শুধু ভারতের নন— সমগ্র জগতের। শুধু একটি কালের নন তিনি চিরকালের। আমাদের জাতির জীবনে বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা বিষয়ে নিবেদিতা এক বিস্ময়।

সম্পূর্ণ এক ভিন্নধর্মের প্রবল শক্তিমান এক মহাপুরুষের আকর্ষণে এবং অনুপ্রেরণায় এক ভিন্ন ধর্মীয়া, ভিন্ন রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারিণী এক নারী ভারতমাতার চরণতলে নিবেদিত হলেন। তাঁর নিবেদিতা নামটি যথার্থ সার্থক। ভারতের জন্য বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য একজন প্রকৃত সিংহিনী রূপেই এলেন। বাংলা ও বাঙালী ধন্য হলো তাদের এই আপনজনকে পেয়ে যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে সকলের কাছে সমাদৃত হলেন। ভারতের নারীদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দূর করার জন্য স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার যে কতদূর জরুরী তা মনে প্রাণে বুঝেছিলেন স্বামীজী। তিনি বিশ্বাস করতেন উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মেয়েরা তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এজন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে নারীদের শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করলেন ভারতমাতার চরণে।

নিবেদিতাকে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন— আমি শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষাব্রতী রূপেই তো তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। নবশিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। শিক্ষিকা রূপে তিনি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আবার একজন বিদেশিনী হয়ে এ দেশে কাজ শুরু করার আগে বাংলাভাষাও শিখে নিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ছাত্রীরা যেন পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, তাঁত শিল্প প্রভৃতি হস্তশিল্প শিখে অর্থ উপার্জন করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। তিনি বলতেন : হায়! শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতিসাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতা বলছেন : ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষা পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত। কিন্তু এ পরিবর্তন কিরূপ হবে তাই প্রশ্ন। একমাত্র উপায়— আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব। যে শিক্ষা বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নমনীয়তা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে তা কখনও প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। তাই নিবেদিতার মনে হয়েছিল ভারতীয় নারীদের জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় শিক্ষাকে গড়ে তোলা। শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন : অন্ততঃ এই আদর্শ নির্বাচনে বোধহয় জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য অধিক। অপর দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁদের মহিমাময় মূর্তি উদ্ভাসিত। ...ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীর যে জাতীয় আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চস্থান প্রদান না করে তা কখনই ভারতীয় নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে না।

এখন থেকে ৮০-৯০ বছর পূর্বেকার কথা। তখন হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষার কোনও সমাদর তো ছিলই না বরং তা ছিল গৌণ। আট বছর হতে না হতে গৌরীদান, মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে পিতামাতার পুণ্যলাভ এসব তো ছিলই। আর সেখানে একজন খৃস্টান নারীর ছোঁওয়া জল পান কি করে সম্ভব? তারপর উন্মুক্ত সাধারণ রাস্তা দিয়ে মেয়েরা পায়ে হেঁটে প্রতিদিন স্কুলে যাবে লেখাপড়া শিখতে— এসব দুঃস্বপ্ন। যাকে স্পর্শ করলে গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হতে হয় তার উপর শিক্ষার ভার! এসব তখন ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। নিবেদিতা এসব বুঝেছিলেন তবু এরই মধ্যে দিয়ে তিনি মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন।

বোসপাড়া লেনের ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে। কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হলো। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন : জগন্মাতার আশীর্বাদ যেন এই বিদ্যালয়ে উপর বর্ষিত হয়। আর এখান থেকে শিক্ষালাভ করবে যে সব ছাত্রী তারা যেন আদর্শ নারীরূপে গড়ে ওঠে। শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাদ বাণী শব্দতরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে।

বিদ্যালয়ের সূচনা পর্বে কী নিদারুণ অবস্থা! কর্মী নেই, অর্থ নেই, সাজসরঞ্জাম উপকরণ নেই, উপযুক্ত গৃহ নেই— আর যেটি সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেই ছাত্রীসংখ্যা গুটিকয়েক। এই দিয়ে কি কোনও বিদ্যালয় চলে? কিন্তু নিবেদিতার অক্লান্ত শ্রম, উদ্যম ও উৎসাহে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকে। বাগবাজার পল্লীর দরজায় দরজায় ঘুরেছেন ভিক্ষুণী হয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করতে। কতজন নিদারুণ রূঢ় কথায় আঘাত করেছে, মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ভর্ৎসনা করেছে কিন্তু কিছুই বিচলিত করতে পারেনি সেই দৃঢ়চেতা নিবেদিতাকে। তিনি যে স্বামীজীর কন্যা! সেই মনোবল, সেই অদম্য সাহসে ভর করে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করতেই হবে। যাতে মেয়েরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলে না যায় বিভিন্ন ভাবে তিনি তাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। সে সময় স্কুলে নির্দিষ্ট কোনও পাঠ্যবই ছিল না। নিবেদিতা মুখে মুখে বিভিন্ন বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। এর সঙ্গে ছিল ছবি আঁকা এবং খেলাধূলা। মাঝে মাঝে ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা করতেন। পুরাণ পাঠ বা কথকতার আসর জমাতেন। স্কুল বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। পরে যখন বয়স্ক মহিলারা অধিক সংখ্যায় আসতে শুরু করে তখন তাদের জন্য আলাদা স্কুল খোলেন। এজন্য ভগিনী কৃস্টিন এবং লাবণ্যপ্রভা বসু পড়ানোর কাজে যুক্ত হলেন। এছাড়া নিবেদিতা অল্পবয়স্ক বিধবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার উপযোগী শিক্ষা দিতে বদ্ধ পরিকর হন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন পরে এরাই শিক্ষা দিয়ে ছাত্রীদের শিক্ষিত করবে এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজী, বাংলা সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত, অঙ্কন ও সূচীশিল্প ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রামায়ণ, মহাভারত বিষয় অবলম্বনে শিক্ষা, তুলির ও মাটির কাজ, মাদুর বোনা ও Paper Folding প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। নানাদিকের নানা সমস্যা ও নানা দায়িত্ব এসে তাঁর কাঁধে পড়ে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টির দায়িত্ব ছিল তাঁর কাছে মুখ্য দায়িত্ব। আর অনগ্রসর এই দেশে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য ও কামনা। বাংলা দেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার কাজ একটি নতুন যুগের সূচনা করে ছিল এবং তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে ও শিক্ষাদর্শনের পেছনে গত ও ভাবী যুগের ভাবধারা ও কর্মধারার একটি যথার্থ সার্থক সমন্বয়ের প্রয়াস ছিল। তাই নিবেদিতার নারীশিক্ষা-চিন্তা বড়ই যুগোপযোগী।

মাতৃভাবের উচ্চতম আদর্শ নিবেদিতা

ঋতা চক্রবর্তী

১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি একজন বিদেশিনী মার্গারেট নোবেল স্বদেশ, স্বজন ছেড়ে স্বামীজীর আহ্বানে তাঁর ভারতগঠনের কাজে যোগদান করতে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। তবে ভারতের জন্য তখন প্রয়োজন ছিল একজন প্রকৃত সিংহীর। ভারতে আসার আগে বহু চিঠিতে স্বামীজী তাঁকে তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। আলমোড়া থেকে ২১ জুলাই, ১৮৯৭ সালে স্বামীজী নিবেদিতাকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি যা লিখেছিলেন তাঁর অংশ বিশেষ 'এদেশে দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পার না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক— তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।... শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্র পাবার উপায় নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।'

অন্তরাত্মার আহ্বান তিনি আগেই শুনেছিলেন। স্বামীজীর আহ্বানে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে চলে এলেন মার্গারেট ভারতবর্ষে।

১১ মার্চ ১৮৯৮। স্টার থিয়েটারে এক সভায় বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করালেন। এই সভায় তাঁর নিজের ভারতসেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতি দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র জগতের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন।' তাঁর বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৭ মার্চ ১৮৯৮ মার্গারেটের জীবনে পরম

ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা

পুণ্যদিন। তাঁর নিজের ডায়েরিতে তিনি দিনটিকে 'Day of days' বলে উল্লেখ করেছেন। পূজনীয়া শ্রীমা তাঁকে গ্রহণ করলেন কন্যারূপে। তিনি হয়ে গেলেন মায়ের 'খুকি'। এই সময় থেকে তাঁর জীবনে ঘটে গেল অদ্ভুত পরিবর্তন। 'মা' ছোট্ট শব্দের মাহাত্ম্য যেন তিনি সাক্ষাৎ করলেন।

২৫ মার্চ ১৯৯৮ দিনটিকে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন; 'এটি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সকাল। কারণ ওইদিন স্বামীজী মার্গারেটকে দীক্ষা দিলেন, নাম রাখলেন নিবেদিতা। স্বামীজী বলেছিলেন 'ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তানদের কাছে তুমি একাধারে জননী, সেবিকা ও বন্ধু হয়ে ওঠো।'

এরপরেই শুরু হলো তাঁর কর্মযজ্ঞ। ভারতের জন্য নিবেদিতপ্রাণা নিবেদিতার শিক্ষায়, সেবায় যে অবদান তার মধ্যে ভাবটি ছিল মাতৃত্বের। তার এই মাতৃভাবেরই প্রকাশ দেখি ভারতের সকল স্তরের মানুষের জন্য, বিশেষত নারীজাতির জন্য। ইংল্যান্ডের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের মতো সুন্দর জিনিস বোধহয় আর কিছুটা নেই। ভারতীয় রমণীর আদর্শ প্রেম নয়, ত্যাগ।' এই ত্যাগের মধ্যেই দেখা গেল মা হয়ে ওঠা।

বোসপাড়া লেনে থাকাকালীন রাত্রে খেতে বসেছেন এমন সময় পাশের প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। ছুটে গিয়ে দেখলেন সে বাড়ির ছোট মেয়েটি মারা গেছে। মেয়েটির মা আকুল হয়ে কাঁদছেন। নিবেদিতার মনে হলো তাঁর কোন পরম আত্মীয়বিয়োগ হয়েছে। শোকাতুরা মায়ের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন। শোকে অবসন্ন মা নিবেদিতাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গেল আমার মেয়ে?' নিবেদিতা পরমস্নেহে বললেন, 'চুপ কর, তোমার মেয়ে এখন কালীর কাছে।' শোকাতুরা মা যেন আশ্বস্ত হলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগের ভয়াবহতার কথা আমরা জানি। সেই সময় নিবেদিতার কর্মযজ্ঞের কথাও জানা। এই সময়ে তাঁর সেবার এক অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ আর জি কর : সেই সময় একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলি-ধূসর কাষ্ঠাসনে

একজন ইউরোপীয় মহিলা উপবিষ্ট। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।' ডঃ কর বাগবাজারের বাগদি পাড়ায় একটা শিশুকে দেখতে গিয়েছিলেন। সে কেমন আছে সেই খবর জানতেই নিবেদিতা এসেছেন। শুনলেন মেয়েটির অবস্থা ভালো নয়। ডঃ কর তাঁকে সাবধানও করলেন এই রোগের বিপদ সম্পর্কে। শিশুটির মা আগেই মারা গেছে, বিকালবেলা ডঃ কর আবার শিশুটিকে দেখতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন; পরমস্নেহে নিবেদিতা মৃত্যুপথযাত্রী শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মৃত্যুর আগে শিশুটিও 'মা' 'মা' বলে নিবেদিতাকে আঁকড়ে ধরছে। গর্ভধারণ নয়, অন্তরের মাতৃভাবেই নিজেকে প্রকৃত 'মা' করে তোলা যায়।

শুধু মমতাময়ী মায়ের রূপই নয়, সকলের জন্য মায়ের তাগব্রতী মহীয়সী রূপটি ফুটে উঠেছে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী লেডি অবলা বসুর লেখায়, 'তাঁর প্রতিবেশীরা জানতেন, তাঁর আয়ের একটা বড় অংশ কিভাবে দুঃখীর প্রয়োজনে ক্ষুধাতুরের ভোজনে ব্যয়িত হোত। নিজ নিতান্ত স্বাচ্ছন্দকেও এর জন্য উৎসর্গ করতেন।' শরীররক্ষার জন্য সামান্য খরচ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'নিবেদিতা যে এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন, তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে। উদ্বৃত্ত হইতেও নহে। একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।'

'...মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। ...এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপন কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।'

পরিবারে মায়ের ভূমিকা পালনের জন্য নিজ পরিবারের আদর্শ, রীতিনীতি বংশমর্যাদা সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত করা মায়েরই কর্তব্য। তেমনি দেশের সংস্কৃতি, আদর্শ তুলে ধরে স্বাভিমানবোধ জাগিয়ে তোলাও মায়েরই দায়িত্ব। নিবেদিতাকে স্বামীজী ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যেপূর্ণ ত্যাগ ও তপস্যাময় ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপটি তুলে ধরলেন। নিবেদিতা ভারতবর্ষের আদর্শে একাত্ম হয়ে

গেলেন।

তিনি বিদ্যালয়ে মেয়েদের শেখালেন, রাণী ভিক্টোরিয়া নয়, ভারতের রাণী 'সীতামাতা'। তিনি মহাভারতের সবচেয়ে বীর রমণী বলেছেন 'গান্ধারীকে' যিনি সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য নিজের ছেলেকেও 'জয়ী হও' আশীর্বাদ করেননি। বলেছেন, 'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ' স্বধর্মে, স্বমার্গে পরম শ্রদ্ধা রাখতে হবে। তাঁর কথায়, 'আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ করে শিক্ষার যথার্থ ফললাভ করা অসম্ভব। অতীতে হিন্দু নারীরা কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে তাঁদের প্রাচীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁদের নম্রতা ও ধর্মভাব, তাঁদের সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও করুণার শিশুসুলভ গভীরতা বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্যের নানা তথ্য সংগ্রহ করে, সামাজিক উদ্দামতার যা অপরিণত ফল তাই গ্রহণ করতে ব্যগ্র হব!'

ভারতমায়ের সকল সম্পদের উন্নতিতে তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। প্রয়োজনে কঠিন হতেও দ্বিধা করেননি। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর অবদানের কথা সুবিদিত। ভারতীয় শিল্প সাধনা করা এবং তাকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুর মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের। ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশ্বকবি থেকে সকলেই স্বীকার করেছেন। 'মা' জানেন সব সন্তানের মধ্যে সব গুণ থাকে না কিন্তু গুণহীন কোনও সন্তান নয়। তাই যাঁর যে বিষয়ে পারদর্শিতা তাঁকে সেই দিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাই সকল মায়ের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা 'আমরা কি নিজেদের সন্তান- সন্ততিদের মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে।'

'মেয়েরাই সর্বদেশে নীতি ও সদাচারের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী।'

নিবেদিতার জননীরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাই বোধহয় শেষকথা : '...মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। ...এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপন কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা।'

ভারতভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

শান্ত সমাহিত শিব-পার্বতীর লীলাভূমি হিমালয়ের কোলে শৈলশহর দার্জিলিং। পাইন বৃক্ষের মর্মর ধ্বনি, মরশুমি ফলের পূর্বাভাস শাখা-প্রশাখায়, জানা-অজানা ফুলের গন্ধে আমোদিত বাতাস। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘা। আনন্দের ফোয়ারা চতুর্দিকে— কৈলাসবাহিনীর মর্ত্যে আগমনোৎসব।

হঠাৎ ছেদ পড়ল আনন্দ-সানাইয়ের। সবেমাত্র গম্ভীর কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশে সূর্যদেব উঁকি মারছেন। 'রায় ভিলা'য় বেজে উঠল সানাইয়ের বিষাদের সুর। প্রকৃতিও যেন তাল মিলিয়ে শোকস্তব্ধ। আকাশ গোমড়া মুখে বসে আছে। 'রায় ভিলা'য় বহু মানুষের ভিড়। এক শ্বেতাঙ্গিনীর মরদেহ বাইরে এল। আরম্ভ হলো শোকযাত্রা। অসংখ্য মানুষের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত। শোকাযাত্রায় শহরের বিশিষ্ট মানুষের দল। তাঁরা পূজাবকাশে দার্জিলিঙে আনন্দ করতে এসেছিলেন। পেলেন রূঢ় আঘাত— তাঁদের আপনজনের দেহাবসান। শোকযাত্রায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নী অবলা বসু, ডাঃ নীলরতন সরকার, অধ্যক্ষ শশীভূষণ দত্ত, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, উদ্ভিদবিদ্ বশীশ্বর সেন, সাংবাদিক রাজেন্দ্রনাথ দে, রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা। শোকমিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। হিল কার্ট রোড হয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শোকমিছিল থামল হিন্দু শ্মশানভূমিতে। হিন্দু-মতে সৎকার হলো শ্বেতাঙ্গিনীর। সৎকারের পর অশ্রুসজল আঁখিতে একে একে সবাই পরিত্যাগ করলেন শ্মশানভূমি। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবরের ঘটনা এটি।

দার্জিলিংয়ে ভগিনী নিবেদিতার সমাধি।

কে এই শ্বেতাঙ্গিনী, যাঁর মৃত্যুতে দার্জিলিং শহর শোকে ভেঙে পড়েছিল? সম্ভ্রান্ত মানুষেরা শবানুগমন করেছিলেন? মৃতদেহ হিন্দু-মতে সৎকার হয়েছিল? শ্বেতাঙ্গিনী হলেন— ভারতকে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম উপহার— ভগিনী নিবেদিতা। লোকামাতা নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে ভারত-সেবায়, ভারত-চিন্তায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দার্জিলিঙে স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত হয়েছিল তাঁর চরম আত্মোৎসর্গের কথা ঃ ''এখানে ভগিনী নিবেদিতা শান্তিতে নিদ্রিতা— যিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন।''

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন 'ভারতবর্ষকে জান, ভারতবর্ষকে ভালবাস।' ভারতবর্ষকে জানা ও ভালবাসার আনন্দ ও যন্ত্রণা নিবেদিতা বহন করেছেন। তখন ছিল পরাধীন ভারতবর্ষ। মুক্তদিনের আলোকলাভের তপস্যায় নিবেদিতা নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু ভারতকে জানা ও ভালবাসার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র কমেনি। গৃহে-পথে-প্রান্তরে অন্ধকার ক্রমেই গাঢ়তর। ভারতবাসী যেন নিবেদিতার আলোকিত জীবনের দীপ ধরে অগ্রসর হতে পারে— এই আশায় আচার্য জগদীশচন্দ্র একদা তাঁর বিজ্ঞানাগারের দ্বারপথে 'আলোকদূতী' নিবেদিতার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই মূর্তি এখনো দীপধারিণী— ভারতবর্ষের জন্য।

(সৌজন্যে : উদ্বোধন)

দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠান।

দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষ পালন

সংবাদদাতা।। গত ১৩ অক্টোবর লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা প্রয়াণশতবর্ষ অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল দার্জিলিং শ্মশানঘাটে বেলা ১১ টার সময়। নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্রীয় কার্যবাহিকা মহুয়া ধর, অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর, উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সঞ্চালিকা রীণা সেনচৌধুরী এবং রামকৃষ্ণ মিশন বেদান্ত মঠের (শিলিগুড়ি) স্বামীজী অমিতাভ মহারাজ, দার্জিলিং শহরের বিশিষ্ট নাগরিক নরেন্দ্র শর্মা প্রমুখ। 'চিরবন্দিতা নিবেদিতা...' গানে অনুষ্ঠানের পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করে তোলেন রীণা সেনচৌধুরী। কার্যক্রম পরিচালনা করেন নরেন্দ্র শর্মা।

ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ কার্যকারিণীর সদস্য রাধাগোবিন্দ পোদ্দার এবং স্বস্তিকা-র প্রচার-প্রসার প্রমুখ রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক।

বক্তব্যের শুরুতেই সুনীতা হলদেকর সারা ভারতবর্ষে নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষের কার্যক্রমের রূপরেখা এবং কলকাতায় আগামী ১০ নভেম্বর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে মহাজাতি সদনে মিলিত হবে বলে জানান। উক্ত জনসভায় ভগিনী নিবেদিতার কর্মময় জীবন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অবদানের কথা আলোচনা করবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা প্রমীলা তাঈ মেড়ে।

চিত্রা যোশী, মহুয়া ধর, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, অমিতাভ মহারাজ নিবেদিতার কর্মময় জীবনের কথা তুলে ধরেন। সবশেষে রাষ্ট্র বন্দনা গান গেয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।